আমি মুক্তিযোদ্ধা
আমি রাজাকার

আমি
ধর্ম
নিরপেক্ষ

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
আল-আজহারী

আমি মুক্তিযোদ্ধা
আমি রাজাকার

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
আল-আয্হারী

প্রকাশনায়ঃ

মুক্তি প্রকাশনী
ইউ/১১ নূর জাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ব্লক ডি
ঢাকা-১২০৭ ফোন ঃ ৩২৮১৩৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
২১ শে ফেব্রুয়ারী, '৯০ ৮ই ফাল্গুন ১৩ ৯৬ সন

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ শোভন-২৫.০০ টাকা
সুলভ ঃ ১৫.০০ টাকা

উৎসর্গ

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিল্পপতি

জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক

চেয়ারম্যান, হাবীব টি লিঃ, মার্ক ফেব্রিকস লিঃ, হোটেল পার্ক ইন্টার ন্যাশনাল, আইনপুর সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, ছাতক লিঃ এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশন ঢাকার আজীবন সদস্য ও বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ সদস্য,
প্রতিষ্ঠাতা, তায়রুননেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় , বালাগঞ্জ , সিলেট।

---এর করমলে

সত্তুরের ঐতিহাসিক নির্বাচন অভিযান কালে যাঁর সুজলা রিভার ওয়েজ কোঃ– এর এম, এল ইনাম নামক সুদৃশ্য মোটর লঞ্চ দু'টিতে সেদিনের বাঙালী জাতির আশা ভরসার প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদল বলে চড়ে ছিলেন এই অপরাধে হানাদার বাহিনী তাঁর উক্ত মোটরলঞ্চ দু'টি পুড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তাঁর সমুদয় সহায়–সম্পদ লুন্ঠন করে তাঁকে দেশছাড়া হতে বাধ্য করেছিল। তারপর মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম, এ, জি ওসমানী সহ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাঁকে কেবল মৌখিক সান্ত্বনা ও আশীর্বাণী দিয়েই বিদায় দিয়েছিলেন।

তারপর নূতন করে যাত্রা শুরু করে আপন অধ্যবসায়ের জোরে যিনি আজ বাংলাদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর নাগরিক ও শিল্পপতি, আর যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধারূপে এ লেখকের সাথে দেশের বর্তমান সংঘাত সৃষ্টিমূলক আত্মঘাতী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ঐক্যমত প্রকাশ করে এ পুস্তক প্রকাশে সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতা যুগিয়েছেন। -- ইবনে সাঈদ

।। পরম করুনাময় আল্লাহ্ তা'আলার নামে।।

পূর্বকথা

মুক্তিযোদ্ধা মহলেও আমি স্বনামধন্য কেউকেটা একজন নই, অথচ "দালালদের" দৃষ্টিতে একজন পাকা "মুক্তি"। পাকিস্তানী হানাদারদের আশীর্বাদধন্য কিংবা স্বাধীনতা-উত্তর লুটেরাদের অংশীদার কারো তালিকায়ই আমার নাম নেই। বরং আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ মওলানা অলিউর রহমান হানাদারদের হাতে ১৪ই ডিসেম্বর "৭১, এ রায়ের বাজারের বধ্যভুমিতে বাঙালী বুদ্ধিজীবি হত্যার সময় একত্রে শহীদ হয়েও মীরপুরের বুদ্ধিজীবি হত্যার স্মারক মিনারে শহীদের তালিকায় উল্লেখিত হন নি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাতেই যে মওলানা জালালাবাদী (উবায়দউল্লাহ বিন সাঈদ) আওয়ামী লীগের ৫১, পুরানা পল্টনস্থ কেন্দ্রীয় দফতরে পঁচিশে মার্চের কালো রজনীতেও বিশ্বস্ত সৈনিকের মতো অবস্থান করছিল, তারপর মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলা বেতারের উদ্বোধন করেছিল সে আমারই হাতে গড়া অনুজ। এতদসত্বেও স্বাধীনতার ন্যুনতম সুফল বা অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা আমাদের পরিবার ভোগ করেনি। যদি সেদিন মুক্তিযুদ্ধকালে প্রাণ হারাতাম, যার আশংকা পদে পদেই ছিল--তবে হয়তো আমার অবস্থাও হতো শহীদ মাওলানা অলিউর রহমানের মতো। কেউ ভুলেও হয়তো নাম উচ্চারণ করতো না। যখন বেঁচেই আছি আর সাপ্তাহিক "অগ্রপথিক" -সম্পাদক বন্ধুবর অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইউম কর্তৃক অনুরুদ্ধও হয়েছি, তাই অতীতের স্মৃতি আর আজকের বেদনা কয়েক ছত্রে লিখে দিলাম। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখক ও অনুসন্ধিৎসু নিরপেক্ষ পাঠকরা হয়তো এতে আনন্দই পাবেন।

পাণ্ডুলিপি শুনে অন্যতম ভাষা সৈনিক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবদুল গফুর ভাই, প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রখ্যাত কলামিস্ট আলহাজ শামস্-উল-হুদা, অধ্যাপক আবদুল ওয়াহেদ খান ফরিদপুরী, ফারুক মাহমুদ ভাই, এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বস্বান্ত আজকের বিশিষ্ট শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী জনাব শামসুল হক প্রমুখ গুণীজন আমাকে এ ব্যাপারে যে উৎসাহ যুগিয়েছেন এ জন্যে আমি তাঁদের কাছে ঋণী। শেষোক্ত শামসুল হক সাহেব মৌখিক উৎসাহ যুগিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর অবদান তার চাইতেও অধিক। তাঁকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ।

একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠকও এ পুস্তিকা পাঠে আনন্দ পেয়ে থাকলে এ শ্রম স্বার্থক মনে করবো।

গনভবন মসজিদ, ঢাকা। আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
একুশে ফেব্রুয়ারী, ৯০/ আটই ফাল্গুন, '৯৬ সন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

আমি মুক্তিযোদ্ধা

আমি রাজাকার

বিজয় দিবস বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোন দার্শনিক গুরুগম্ভীর তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, একান্তই নিজ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি বর্ণনার উদ্দেশ্যে প্রথম বিজয় দিবসের দীর্ঘ দেড়যুগ পরে কয়েকটি কথা নিবেদন করছি। কেননা, আমি বা আমার পরিবার তখন কেবল বিজয়ের একজন নির্বাক দর্শকই ছিলাম না ; এ বিজয়ের সন্ধানে শত শত মাইল দুর্গম পথ এ জন্যে আমাদেরকে পাড়ি দিতে হয়েছে, কাটাতে হয়েছে অনেক বিনিদ্র ও দুঃস্বপ্নের কালোরাত। সে বিজয়ের প্রতীক্ষায় দিনক্ষণ প্রহর গুণতে হয়েছে ।

পঁচিশের মার্চের যে কালোরাতে ঢাকাবাসী নিরীহ জনতার উপর হানাদারদের কামান গর্জে উঠেছিল, সে রাতে ৫১নং পুরানা পল্টনের আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় দফতরের মতো বিপজ্জনক ঘরটিতে আমার অনুজ উবায়দুল্লাহ্ বিন সাঈদ(মওলানা জালালাবাদী) অবস্থান করছিল। সারারাত ধরে তুমুল হত্যাযজ্ঞ চললেও সে রাতে সেখানে কিন্তু কোন হামলা হয়নি। কেননা, গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছে, সেখান থেকে চিড়িয়ারা উড়ে গেছে। পরদিন যখন সে শত্রুকিল্লার উপর আক্রমণ হলো, তখন অনেকটা অলৌকিক ভাবেই আমার সহোদরটি কক্ষের একমাত্র পেছনের জানালাটির গ্রীল একটা শাবলের দ্বারা ভেঙ্গে সেই যে পালিয়ে বেরোলো, তারপর বিজয় দিবস আসার পূর্বে আর আমাদের নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় ছিল না। তারপর সে বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে জিঞ্জিরায় মওলানা অলিউর রহমান শহীদের ওখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দুসরা এপ্রিল ভোর বেলা যখন ওখানেও শহর থেকে তাড়াখাওয়া লোকজনের উপর হামলা চালাতে হানাদার বাহিনী গিয়ে উপস্থিত হলো, তখন সেখানেও আর কোন মুক্তিসংগ্রামী নিরাপদ ছিলনা। আওয়ামীলীগ কর্মী, ছাত্র, যুবক, যে-ই হানাদারদের চোখে পড়েছে, তারা তাকেই নির্বিচারে গুলি করেছে। সহোদরটি তার মওদুদী বিরোধী বক্তৃতা বিবৃতির জন্যে শুধু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেই নয়, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান ও সীমান্তের গ্রামে গঞ্জে পর্যন্ত তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিলো। মওলানা গোলাম গউস হাজারভী ও মুফতি মাহমুদ প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানী ওলামা ঢাকায় নেমে তাই এই বিখ্যাত

মওলানাকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। পাঞ্জাবী-পুশতু-সিন্ধি ভাষার পত্রিকাসমুহে তাঁরা তার নাম পড়েছিলেন। সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের সময় রমনা সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের বক্তৃতা মঞ্চে শেখ মুজিবের পাশে ত্রিশ লক্ষ লোক মওলানা জালালাবাদীকেও দেখেছে। তার নাম সেদিন ঐ ঐতিহাসিক জনসমুদ্রে উচ্চারিতও হয়েছিলো । জামাত কর্মীরা তাকে সর্বত্র চোখে চোখে রাখত । তাই তার আত্মগোপন করে থাকার কোন উপায়ই ছিল না। অগত্যা সে সিলেটের উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়। মওলানা জালালাবাদী নামটা তখন মুক্তি যুদ্ধের স্বপক্ষের লোকজনদের অতি পরিচিত ও প্রিয় নাম। তাই রাস্তাঘাট ও রেল চলাচল বন্ধ থাকলেও সিলেট পর্যন্ত গিয়ে পৌছতে তার তেমন অসুবিধে হয়নি। কোথাও লঞ্চে, কোথাও জীপে আবার কোথাও বেবীটেক্সী দিয়ে তারা এগিয়ে দিয়েছে, তাদের এলাকা অতিক্রম করিয়ে দিয়েছে তাদের প্রিয় "মওলানা জালালাবাদীকে" । এভাবে আমার অনুজটি যখন ৪ঠা এপ্রিল একাত্তুরে সিলেটের টুকের গাঁওয়ে আমাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলো, তখন আমাদের বাড়ীতে ঈদের খুশী । চতুর্দিক থেকে লোকজন এসে জমায়েত হয়েছিল আমাদের বাড়িতে। সবাই প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে ঢাকার অবস্থা শুনতে চায়। কারণ, ঢাকার রেডিও পাকিস্তান দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন খবরই প্রচার করছিল না। ভারতের "আকাশবাণী" সেই পঁয়ষট্টির যুদ্ধকাল থেকেই বৈরী বলে পরিচিত। বি,বি,সি, রেডিও অস্ট্রেলিয়া এবং ভয়েস-অব-আমেরিকা একটা ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের খবর দিয়ে যাচ্ছিলো। গ্রাম বাংলার মানুষ তখনো ঠাহর করে উঠতে পারছিল না যে রাজধানী শহরে কি একটা ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল , তাই চট করে কেউ দেশের বাড়ীতে গিয়ে ঢাকার সঠিক সংবাদ পরিবেশন করবে, তারও কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এমতাবস্থায় একেবারে আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় অফিসে গোলাবারুদের মুখে বসবাসকারী একজন প্রত্যক্ষদর্শী পেয়ে দেশবাসী লোকজন পরম আগ্রহভরে তার কাছ থেকে প্রকৃত বিবরণ শুনবার জন্যে এসে ভিড় করলো।

এর আগের ঈদে (ঈদুল ফেতেরে) অনুজটি যখন বাড়ী গিয়েছিল, তখনই ঈদের খাওয়া-দাওয়ার সময় একই দস্তরখানে বসে যখন আমরা আমাদের অশীতিপর বৃদ্ধ আব্বার সাথে নানারূপ পারিবারিক কথাবার্তা বলছিলাম, তখন আব্বার সম্মুখেই আমি তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলাম, "নির্বাচন শেষ হয়েছে,আওয়ামী লীগ তথা বাঙালী জাতীয়তাবাদ জিতে গেছে , ব্যস এবার তুমি রণে ক্ষান্ত দাও ! আওয়ামী লীগ অফিসে আর বাস করার প্রয়োজন নেই। ওখানে থাকা নিরাপদও নয়। ভোটে

জিতলেই যে, পার্টি পাওয়া যাবে , তার কোনই নিশ্চয়তা নেই। এমনও তো হতে পারে যে, সব কন্টুটি এম. এন. এ এম পিকে জেলে পুরে পার্টিকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। দলের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজনকে জেলে পুরে দেয়া হবে। অযথা এত বড় একটা ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে লাভ কি ?" আব্বাও সেদিন আমার কথায় সায় দিয়ে ছিলেন। আর আব্বার সাথে এটাই ছিল আমার অনুজ মওলানা জালালাবাদীর শেষ ঈদ। সে বাড়ীতে ফিরে বলেছিল, সীমান্তের কাছ দিয়েই সে সিলেট গিয়েছে। সঙ্গী সাথীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ওপারে আগরতলায় চলে গিয়েছে। আমি কেবল আব্বার সাথে শেষ দেখাটা করে যাওয়ার জন্যে বাড়ীতে এসেছি। কি জানি, পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কী পর্যন্ত গড়ায়। কি জানি বাড়ীতে ফিরে আর আব্বাকে দেখা হয়ে উঠবে কি না। সত্যি সত্যি এটাই ছিল আব্বার সাথে তার অন্তিম সাক্ষাৎ । আমাদের দু'ভায়ের দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী আর আশংকা যে এমনি অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে, তা কল্পনাও করিনি।

পঁচিশে মার্চের কালোরাতের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের কথা বিদেশী বেতারে শুনবার পর থেকে কনিষ্ঠতম ভাইটির জন্যে মনে কী যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিলো তা ভাষায় ব্যক্ত করবার মতো নয়। কারণ , সে আমার কথা মত স্থান ত্যাগ না করে তখনো যে আওয়ামী লীগ অফিসেই বসবাস করে যাচ্ছিলো । এখন আমাকে কে বলবে যে, সে রাতে তার ভাগ্যে কী পরিণতি ঘটেছে। আমি তখন পাগলের মতো দিনরাত কেবল বিড় বিড় করে দোয়া কালামই পড়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় যখন সে সহী-সালামতে বাড়ীতে এসে পৌছলো, তখনকার আমার আনন্দ আমি কি করে কোন্ ভাষায় প্রকাশ করবো ?

কিন্তু আমার সে আনন্দ ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। আমাদের বাড়ীতে লোকজনের ভিড় আমার জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আশে পাশের প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকেই আমার ভাইটির তথা গোটা পরিবারের সমূহ বিপদ ঘটার আশংকা ছিল। চাচা মওলানা আবদুর রশীদ সাহেব ছিলেন সেই উনিশ শ তেতাল্লিশ থেকে তেষট্টি পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়িবছর কাল সিলেট জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি. । তিনি ছিলেন আসলে উত্তর সিলেট তথা সদর সিলেট মহকুমা মুসলিম লীগের সভাপতি। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এ একটি মহকুমাকে দিয়েছিল জেলার মর্যাদা। কারণ, গনভোট সংগ্রামের রণক্ষেত্র ছিল তৎকালীন আসাম প্রদেশের এই সিলেট জেলা। আর সিলেট জেলার সদর দফতর হিসাবে সদর সিলেট বা উত্তর সিলেট মুসলিম লীগের গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। তাই আমাদের আত্মীয়-

স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদেরকে মুসলীম লীগের হয়ে এত ত্যাগ স্বীকার ও সংগ্রাম করতে হয়েছে যে পাকিস্তান এদের রক্তে মাংসে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল যে, এর বিরুদ্ধে কোন কথা কেউ শুনতে বা মেনে নিতে কখনো রাজী ছিলেন না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন কথা মাত্রই আমাদের এলাকায় ছিল দেশদ্রোহী জাতিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র--মহা পাপের শামিল। আমারই ভাইটি আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের সাথে মিলে পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একথা তারা কোন মতেই মেনে নিতে পারছিল না। এমন কি জামাতে ইসলামী ও মওদুদী বিরোধী ফতোয়া বা বিবৃতি কেন জালালাবাদীর নামে পত্রপত্রিকায় প্রচারিত হয়, তাও ছিল জামাতপন্থী আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপড়শীদের একটা বিরাট প্রশ্ন। এমন কি সামাজিকভাবে পঞ্চায়েত বসেও এ সম্পর্কে তারা কয়েকবার শলাপরামর্শ করেছে।

কিন্তু তখন দেশের বাড়ীতে আমার উপস্থিতির দরুন কেউ এ নিয়ে বেশী সুবিধা করে উঠতে পারেনি। কিন্তু তখন ছিল এক পরিস্থিতি আর এখন অন্যরূপ। কেউ মিলিটারী ক্যাম্পে খবর পৌঁছিয়ে দিলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে মিলিটারী জীপ আমাদের বাড়ীতে এসে পৌঁছবে। কারো কোন যুক্তিতর্ক উত্থাপনের অবকাশও থাকবেনা। তাই পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। রাত্রের বেলা এ দেশদ্রোহী জাতিদ্রোহী বিষাক্ত জাত সাপকে কোথায় শুইতে দেই এটাই দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। চতুর্দিকে খবর রটে গেছে, জালালাবাদী বাড়ী এসে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে গোটা দেশবাসীকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। এমতাবস্থায় বাড়ীতে শোয়া মোটেও নিরাপদ ছিল না। অগত্যা মধ্যরাতের পর তাকে গ্রামের মসজিদেই বিছানা দেয়া হলো। ফজরের পূর্বেই ঘরে ফিরে নাশতা করে ভাইটিকে নিয়ে চললাম দুই মাইল দূরবর্তী নানাবাড়ীতে ।

আব্বাকে বললাম, ওকে বাড়ীতে এমন কি পাকিস্তান সীমানার মধ্যে রাখা আদৌ নিরাপদ নয়। যে করেই হোক, দেশের সীমা পার করে ওপারে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু আমাদের ওখান থেকে ওপার বলতে তো ডাউকী-খাসিয়া পাহাড়। একান্তই অপরিচিত বন্য পাহাড়ী পরিবেশ। পরিচিত একটা মুখও সেখানে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অথচ ভাইটির বয়স তখনো পঁচিশও হয়নি। দেশব্যাপী তার ডাকনাম ও পরিচিতি থাকলেও আমার কাছে তো ছোট ভাইটিই। আব্বার কাছে মামার কাছে সে তাদের আদুরে খোকা। আব্বা পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন, তাই তাকে পার করে দিয়ে আসবার সময় অনুমতি পেতে বেগ পেতে হলো না। কিন্তু মামা নাছোড়বান্দা। মামা ছিলেন আমার মরহুমা আম্মার বড় ভাই এবং একমাত্র মামা। তিনি কোনমতেই এ অপরিচিত পাহাড় জঙ্গলের দেশে তার "কচি" দুটি ভাগ্নেকে একা

যেতে দেবেন না। ঘটনাচক্রে আমাদের সীমান্ত এলাকা মানে খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশের এলাকাটা ছিল তাঁর জানাশোনা এবং তার বেশ কিছু পরিচিত লোকজন সেখানে রয়েছেন বিধায় আমাদেরকে অন্তত: দেশের সীমা পার করে দিয়ে আসাটাকে তিনি নিজের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করলেন। অথচ তখন বর্ষাকালও ছিল না যে নৌকায় করে পথ চলা যাবে, আবার উত্তরের পাহাড়ের দিকে এগুতে হলে রীতিমত কোন স্থলপথ বা যানবাহনও নেই। এপ্রিল মাস। মাথার উপর বেশ কড়া রোদ। অথচ নীচে চষা মাটি। সেই চষা মাটি ভেংগে প্রায় ত্রিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে সত্তুরের কোঠার একজন বৃদ্ধ আপন ভাগ্নেদেরকে নিয়ে অনিশ্চিতের পথে এগিয়ে চললেন। পাঁচই এপ্রিল একাত্তুরের ভোরে সিলেটের খাদিম নগর ইউনিয়নস্থ চাতল গ্রাম থেকে রওয়ানা করে সারাদিনে আমরা গোয়াইনগাট থানার নিকটবর্তী নগর গ্রামে গিয়ে পৌছিলাম। মামার সাথে এক আত্মীয় তরীকুল্লাহর বাড়ীতে গিয়ে যখন উঠলাম তখন রাত হয়ে এসেছে। সারাদিন চষা মাটির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এতই ক্লান্ত হয়েছিলাম যে খুব সহজেই ঘুম পেলো। তারপর সকালে জেগেই আবার নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আমরা পাহাড়ের ঢালুপথ অতিক্রম করতে করতে রাধাগঞ্জ চা বাগানেরে মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। ছয় সাত মাইল পথ হাঁটতে পারলেই ডাউকী সীমান্ত। ডাউকীর পাহাড়ী নদীর এপারে পূর্ব পাকিস্তান, ওপারে ভারত। পূর্ব পাকিস্তানে জীবন অনিশ্চিত, ওখানে আশ্রয়ের আশা আছে। প্রায় একটায় গিয়ে আমরা ডাউকীতে পৌছলাম। সীমান্তরক্ষী জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন , বি,এস,এফ দফতরে, নাকি থানায় ? বি,এস, এফের সাথে আগে কোন পরিচয়ই ছিল না। আসলে ওটা হলো ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী- আমাদের বর্তমানের বি ডি আর এর মতো। নূতন বস্তুর প্রতি কৌতূহলের বশে আমি বলে বসলাম, বি-এস-এফে যাবো। একজন নিয়ে পাহাড়ের উপর বি এস এফের অধিনায়নক কানপুরের জনৈক হিন্দু কর্ণেলের নিকট উপস্থিত করলো। পাঞ্জাবী-সেলোয়ার পরা শ্মশ্রু মণ্ডিত ধর্মীয় চেহারার তিন জন মুসলমান আগন্তককে দেখে ওদের সন্দেহ করার যথেস্ট কারণও ছিল। তাই আমার পকেটস্থ মোটা প্রেসিডেন্ট কলমটা পর্যন্ত তিনি আমারই হাতে খুলিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখলেন। আমি বললা, "না ওতে কোন অস্ত্র বা যন্ত্র নেই, নিছক একটা মোটা কলম"। আমার এ ব্যঙ্গাত্মক কথায় কর্ণেল কিছুটা সঙ্কোচিত হলেন। বললেন ঃ "ওটা আমাদের পেশাগত দায়িত্ব, কিছু মনে করবেন না যেন।" নদীয়া শান্তিপুরের সুখশ্রাব্য বাংলার মতো কানপুর লক্ষ্মৌর মিস্টি উর্দু শুনতেই মনটায় শান্তির পরশ পেলাম। কিছুটা আশ্বস্তও বোধ

করলাম। যাক, একটা ভদ্রলোকের কাছে আসা গেছে। জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় থাকবেন, আমাদের এখানে , না থানায়" ? মুখে বললাম, আমরা তো এখন আপনাদের ঘরে অতিথি , যেখানে রাখবেন, সেখানেই থাকতে হবে।কিন্তু মনে মনে ভাবছিলাম যদি পাহাড়ের ঢালুতে ঐ নীচের মসজিদে থাকতে পারতাম, তাহলে নিজস্ব পরিবেশে যেমন থাকা যেতো, তেমনি দু'একটা মুসলমানেরও হয়তো দেখা পাওয়া যেতো। কিন্তু ও কথাটা মুখে বলতে চাইলাম না। বললেন, "বেশ, আমাদের সৈন্যদের সাথে আমাদের ক্যাম্পেই থাকুন না !" বল্লাম, "স্পষ্ট বলুন, এখন আমরা স্বাধীন মেহ্মান, না আপনাদের হাতে বন্দী ?" বললেন, বন্দী হবেন কেন ? আপনরা স্বাধীন। বল্লাম, ধর্মকর্মের ব্যাপারেও আমরা স্বাধীন তো ? বললেন : অবশ্যই। বল্লাম কিন্তু আমাদের ধর্মে যে পাহাড়ে-জংগলে বা প্রান্তরে বিয়াবানে নামায পড়তে হলে আযান দেয়ার বিধান রয়েছে! ফজরের সময় যখন আমরা আল্লাহু আকবর বলে আযানের উচ্চরব তুলবো তখন রাম রাম করে আপনাদের জওয়ানরা যবন মারবার জন্যে ধেয়ে আসবে না তো ? কানপুরের কর্ণেল। তাই মুসলমানদের আযানধ্বনি তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। তিনি একটু চিন্তিতই হয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই বল্লেন : ঐ তো পাশে মসজিদ সেখানে গিয়ে আপনারা নামায পড়ে আসবেন । বল্লাম : আমরা যে পাহড়ে উঠা নামায় আদৌ অভ্যস্ত নই, ঐ এক বার উঠেছি দ্বিতীয়বার তো উঠতেই পারবোনা । বিশেষ করে আমরা এখন খুবই ক্লান্ত। ছাত্রজীবনে বি, এ না পড়ে আমি উর্দু ডিপ্লোমা ও উচ্চতর ডিপ্লোমা পড়ে ছিলাম, তাই কর্ণেল আমার সাথে আলাপ করে নিজেও অনেকটা আপন আপন বোধ করেছিলেন। তিনি আমার বক্তব্যের সারবত্তা মেনে নিলেন এবং আমার মনোভাব আচঁ করতে পেরে মসজিদেই আমাদের থাকবার ব্যাপারে মত দিলেন। আমি বললাম, খাওয়া দাওয়া পাক সাকের ব্যাপারেও আমাদের নিজস্ব একটা নিয়মনীতি আছে বিধায় আমরা নিজ হাতে পাকসাক করে খাওয়াই পসন্দ করবো। তাই আমাদের প্রয়োজনীয় কম্বল এবং ডাল চাল ওখানেই পাঠিয়ে দেবেন, আমরা আমাদের মতো করে খাওয়া দাওয়া করবো। কর্ণেল আমাদেরকে থানার হাতেই তুলে দিলেন। কারণ মসজিদটা থানার পাশেই এবং থানার ওসি ছিলেন একজন সিলেট থেকে যাওয়া বাঙালী হিন্দু। আমাদেরই সিলেটের গোবিন্দগঞ্জ এলাকার দুলার বাজার থেকে ওরা গিয়েছিলেন দেশ বিভাগের সময়। থানায় এসে যখন দেখলাম, থানার ওসি আমারই বয়সী একজন ভদ্রলোক, তখন আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। হাজার হোক, একজন স্বদেশী লোক। তিনি অনেকটা আপন জনের

মতোই করে বললেন, কিছু মনে করবেন না যেন, এখানকার খাসিয়ারা ভীষণ মাদকাসক্ত। মসজিদের বাইরেই খোলা জায়গাটায় ওরা মদ পান ও হট্টগোল করে অনেক রাত পর্যন্ত। আপনারা ভাল করে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বেন এবং কেউ ডাকাডাকি করলেও দরজা খুলবেন না। আমি পুলিশ প্রহরা রাখবো, যাতে আপনাদের কোন অসুবিধে না হয়। আপনারা কিন্তু এতে আমাকে ভুল বুঝবেন না যেন।

ডাউকীর মসজিদটি বহুকাল ধরে নামাজীশূন্য। সেই সাতচল্লিশের পূর্বে যখন ভারত-পাকিস্তান এক রাষ্ট্র ছিল, তখন নির্মিত হয়েছিল মসজিদটি। তারপর দেশবিভাগ এ সাম্প্রদায়িক তিক্ততার পর ওখানে কোন মুসলমান আর থাকেনা। সীমান্ত এলাকার মুসলমানরা ডাউকীর হাটের দিন দুপুরের দিকে সীমান্তের ওপারের ডাউকীর বাজারে সওদাপাতি কিনতে বা বেচতে যায়। সন্ধ্যার অনেক আগেই তারা ফিরে আসে সীমান্তের এপারে নিজেদের বাড়ীতে। সুতরাং বিগত পঁচিশটি বছর ধরে ওখানে আযান নামক কিছুই হয়না। মসজিদের গা ঘেঁষেই মসজিদ কম্পাউণ্ডেই এপার থেকে যাওয়া কয়েকটি হিন্দু পরিবারের বাস। এর মধ্যে একটা মুসলিম দম্পতিও আছে। পুরুষটির নাম আলী, বাড়ী কুমিল্লা জেলায়, বউটি তার সিলেটী। নামায তারা নিজেরাও পড়েনা। তবে, আলী প্রতিদিন সন্ধ্যায় মসজিদ ঝাড়ু দিয়ে ধূপ ধোনা জ্বালিয়ে দেয়। সুতরাং মসজিদটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বসবাসোপযোগীই রয়েছে। আমাদের সুবিধা হলো, আলীই তার বউকে দিয়ে পাক সাক করে আমাদের খাবার পরিবেশন করতো।

আলীর মুখ থেকেই শুনলাম, দেশ বিভাগের সাথে সাথে বেশ ক'টি হিন্দু পরিবার গিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে উঠে ঐ মসজিদটিতে । আল্লাহ্‌র কী মর্জি, ওদের মধ্যে ওলাউঠা দেখা দেয়। বেশ ক'জন মারাও যায়। তারপর ঐ হিন্দুরাই মনে করলো, আল্লাহ্‌র ঘরের অবমাননার জন্যেই আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপর নেমে এসেছে। তারপর তারাই অনেক খোঁজাখুঁজি করে আলীকে কোত্থেকে ধরে নিয়ে আসে এবং তাকেই মসজিদের সেবায় নিয়োজিত করে নিজেরা বিপদ মুক্ত থাকতে প্রয়াসী হয়। সেই থেকে আলী ওখানে ওদের সাথে মিশেই আছে। তার মুখ থেকেই শুনলাম, একবার পাহাড়ে ওখান থেকে সত্তুর মাইল দূরে এক মুসলমান মারা যায়। অপর কোন মুসলমানই ছিলনা সেখানে । তারপর আলীকে লোকে এ খবর দিলে সে নিজ খরচে ঐ সত্তুর মাইল পথ অতিক্রম করে নিজে সেই মুসলমান লাশটি দাফন করে আসে। নামাজরোযা না করলেও মুসলমানী একটা দরদ ঐ গরীব মুসলমানের মনেও যে

জাগরুক, তা বেশ বুঝা যায়। ঐ ঘটনাটির কথা বলতে গিয়ে সে বেশ আত্মতৃপ্তি বোধ করছিল লক্ষ্য করলাম। আমরাও তার এ মহান খেদমতের কথা শুনে বেশ সুখ অনুভব করলাম এবং তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

পরের দিন সকালেই ওসির সাথে দেখা করতে গেলাম ডাউকী থানা হেড কোয়ার্টারে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা পাকা ঘর। যতদুর মনে পড়ে টালির ছাদ। পাশেই ওসির কোয়ার্টার । ওদিকে রাতে এক কাণ্ড। খাসিয়া নাকি মনিপুরী উপজাতীয় একটা পুলিশকে দেয়া হয়েছে মসজিদ প্রহরার উদ্দেশ্যে। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় আমাকে আমার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলো। আমিও অনেকটা ওর মত করে বললাম, আমাদের দেশে হত্যাযজ্ঞ চলছে, আমরা তাই তাদের দেশে চলে এসেছি আশ্রয়ের খোঁজে। আমরা যাব শিলং–তারপর কোলকাতা, দিল্লী বা অন্য কোথাও। সে প্রতিবাদ করে ইশারায় বললো, আমাদের মতো যতো দাড়িওয়ালা মুসলমান, তারা সর্বদা ভারত থেকে পাকিস্তানে যায়। আর ওর নিজের মুখের দিকে দেখিয়ে বললো, ওর মত যতো ক্লীন শেভ্ড্ হিন্দু, তারা যায় পাকিস্তান থেকে ভারতে। এখন তার উল্টো হতে যাবে কেন? নিশ্চয়ই আমাদের অন্য কোন মতলব আছে। আমরা তা গোপন করলেও সে তা ধরে ফেলেছে। আমি বললাম, তোমার তাতে কাজ কি বাপু, তুমি যে ডিউটিতে এসেছো, তাই করো, আমাদের ব্যাপার বুঝবে ওসি সাহেব ও আরও বড় সাহেবরা। সে একটা অশ্রাব্য কথা বলে তাতে চরম বিরক্তি প্রকাশ করলো, আমরা যে তাকে উপেক্ষা করছি বা সঠিক কথা বলছি না, তা মনে করে সেও আলাপে ক্ষান্ত দিয়ে নিজে বন্দুক নিয়ে ডিউটীতে দাঁড়িয়ে রইলো।

সারা দিনের ক্লান্ত আমরা এশার নামায পড়েই খাওয়া দাওয়া করে ন টার দিকেই শুয়ে পড়লাম। এক নাগাড়ে ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন গোটা ডাউকী আর খাসিয়া জৈন্তা পাহাড় অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আগের দিনই আসরের আযানের সময় লক্ষ্য করেছিলাম, আযানের অশ্রুতপূর্ব ধ্বনি শুনে আশপাশের অনেক খাসিয়া নারী পুরুষ এসে মসজিদের পাশে জমায়েত হয়েছিল। পরম ঔৎসুক্য ভরে তারা আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। যেন অন্য কোন গ্রহের জীব এসে পড়েছে তাদের পাহাড়ী এলাকায়। খাসিয়া বুড়োরা দূরদুরান্তের মুসলমান এলাকায় গিয়ে আযানের ধ্বনি শুনে থাকলেও ওরা তা কোনদিন শুনেছে বলে মনে হলো না। অদূরেই পাহাড়ের উপর পাহাড়ী বাংলো থেকে বিদেশী ইউরোপীয়, আমেরিকান সাংবাদিক ও পথিকরাও অত্যন্ত ঔৎসুক্য ভরা দৃষ্টিতে আমাদের তিনজনের দিকে

তাকাচ্ছিলেন। তাদের এ সমবেত ঔৎসুক্য আমাদেরকেও আমাদের অস্তিত্বের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছিলো। আমরা অনুভব করলাম,আমরা তিনজন ঐ পাহাড়ী এলাকায় গোটা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছি । আমাদের আযান ও নামায ইসলামের মস্ত একটা তাবলীগের কাজ করছে। আমাদের জামাতের নামাযও তারা বেশ ঔৎসুক্যভরে দেখছিল। এরূপ ঔৎসুক্যভরা দৃষ্টিতে আমাদের নামাযের ও জামাতের দিকে তাকিয়েছিল ব্যাংকক বিমান বন্দরের লোকজন ১৯৮০ সালে-যখন আমারই আযানের পর আমারই ইমামতিতে বিমান বন্দরে কুড়িজন বাংলাদেশী ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়াগামী ধর্মীয় প্রতিনিধিদলের আলেমগণ জামাতে দাঁড়িয়েছিলেন সারিবদ্ধভাবে। বিদেশী বিজাতীয়রা যখন আমাদের নামাযের জামাতের দিকে এরূপ ঔৎসুক্য নিয়ে তাকায়, তখন আমাদের নিজেদের কাছেও নামাযের জামাত এক স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠে।

থানার ওসি বাবু সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে দেখে। অনেকদিন পর দেশী প্রতিবেশীকে কাছে পেয়ে তিনি নিজেও সুখী মনে হলো। চা-বিস্কুটে তিনি আমাদেরকে আপ্যায়িত করলেন। এসময় একটা খাসিয়া রমণীকে দেখলাম ভীষণ গালাগালি করছে ওসি বাবুকে আর বার বার ঘৃণাভরে মুখের থুথু ফেলছে ওসি বাবুকে অশ্রদ্ধা জানিয়ে। এর একটু আগেই একটা আসামীকে গাড়ীতে করে চালান দেয়া হয়েছে শিলং-এ ।খাসিয়া রমণীর ভাষা আমরা না বুঝলেও হাবভাবে ও অঙ্গভঙ্গিতে বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে সে ওসিবাবুর আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছাড়ছে। ওসি জানালেন, গতরাতে যে শান্ত্রীকে দেয়া হয়েছিল আমাদেরকে পাহারা দেয়ার জন্যে, রাতে ঐ মহিলাটির মদ্যপ স্বামী ওর মাথায় আঘাত করে ওকে আহত করে ফেলে। একটু আগে শিলং-এ চালান দেয়া সে আসামীটি এ রমণীরই স্বামী। এ হচ্ছে এলাকার একটা প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী মহিলা। নারী শাসিত এ খাসিয়া জনপদে সে-ই তার স্বামীর অভিভাবক। তাকে না জানিয়ে বা তার আসার অপেক্ষামাত্র না করে ওসি কেন তাকে চালান দিতে গেলেন ? হাবভাবে মনে হলো, সত্যি সত্যি মহিলাটি যদি ওকে চালান দেয়ার আগে থানার এসে পৌছতো, তবে নিজ প্রভাব খাটিয়ে বণ্ডসইটা দিয়ে সে স্বামীকে থানা থেকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতো। ওকে চালান দেয়া বা ওর বিরুদ্ধে চার্জশীট তৈরী করা হয়তো তার স্থানীয় প্রভাবকে উপেক্ষা করে সম্ভবপরও হতো না। ওসি বললেন, এ বুনোদেরকে নিয়ে কী জ্বালা,দেখলেন তো! এভাবেই বনে জঙ্গলেকেটে যাচ্ছে আমাদের দিনগুলো।

খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে ডাউকী একটা ছোট্ট বাজার। গোটা কয়েক হিন্দু

পাইকার ছাড়া সকলেই এখানকরা উপজাতীয় খাসিয়া। খাসিয়াদের মধ্যে প্রকৃতি পূজারী আছে, আবার বেশ কিছু খাসিয়া খ্রীষ্টানও হয়ে গেছে। খাসিয়া ভাষায় ছাপা খ্রীষ্টানদের বাইবেলের টুকরো অংশও দেখলাম ডাউকীতে। হিন্দু পরিবারগুলো বাঙালীই। ওসির ওখানে এবং একটি বাঙালী হিন্দু পরিবারে আমি কয়েকবার গিয়েছি। পঁচিশে মার্চের মিলিটারী অপারেশন ও আসন্ন ঝড়ের মোকাবেলা করার জন্যে ডাউকীতে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সহ বিভিন্ন ধরণের সরকারী তৎপরতা লক্ষ্য করলাম। ওসি আমাদেরকে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করার অধিকারই দিলেন। কেননা, তিনি আমাদের স্বদেশে ফিরবার পথে অসুবিধার কথাও বেশ বুঝতে পারছিলেন বলে মনে হলো। ওসি আমাদের পরবর্তী ইচ্ছে বা গন্তব্যস্থল কি জিজ্ঞেস করলেন। আমরা বললাম আমরা শিলং এ গিয়ে উর্ধতন সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করতে চাই। তারপর যাবো দিল্লীতে। ঢাকার সামরিক হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে আমরা বিশ্ববাসীকে অবহিত করতে চাই। ওসি বললেন, আমি উপরে জানাচ্ছি। কোন সরকারী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আপনাদেরকে এখানেই দু'একদিন অপেক্ষা করতে হবে।

দেখতে দেখতে দু'টি দিন চলে যাচ্ছে। কিন্তু উপরের কোন নির্দেশ এসে পৌছলো বলে মনে হলো না। তবে, ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এসে কয়েকবারই আমাদের সাক্ষাৎকার নিলেন।

ততক্ষণে আরেকটা কাণ্ড ঘটে গেছে। বাজারের পথ অতিক্রম করতে গিয়ে সামনেই পড়লো পোষ্ট অফিসও টেলিগ্রাম অফিস। শিলং-এ সরাসরি ডায়লিং বা কল করবার ব্যবস্থাও আছে। আমি সরাসরি মেঘালয়ের মুখ্য মন্ত্রীর বাসার টেলিফোন করলাম। তার উপজাতীয় স্ত্রী কীযে বললেন, বুঝতে পারছিলাম না। পরে আমি যখন ইংরেজীতে আমাদের পরিচয় দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাই বলে বললাম তখন মহিলাটিও ইংরেজীতে জানালেন, চীপ মিনিস্টার ইজ আউট নাও। সম্ভবতঃ গোয়েন্দা সংস্থার লোক কাছেই ছিল। গোটা ডাউকীতে কথাটি জানাজানি হয়ে গেল যে দুতিনজন মৌলবী গোছের আগন্তুক দুদিন আগে ডাউকীতে এসে উঠেছে। এরা সাংঘাতিক লোক। মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত তারা টেলিফোন করে। ফলে, গোয়েন্দা তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পেলো। ওসি এবং গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন জানালো যে চীফ মিনিষ্টারকে কল করে তো আমরা ওদের চাকুরী খাওয়ার ব্যবস্থা করে বসেছিলাম। আমরা বললাম আমাদের যে গরজ অনেক বেশী। আপনারা আমাদেরকে ডাউকীতে আটকে রেখে তো আমাদের মিশনই মাটি করে দিচ্ছেন।

আমাদের ঘরবাড়ী পুড়ছে। আত্মীয় স্বজন মরছে অথচ আমরা,এখানে আরামে ঘুমোবো, এটা কি করে সম্ভব? বিশ্ব বাসীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা অবগত করতে হবে এবং তার একটা বিহিত করতে হবে। তৃতীয় দিনে উপর থেকে মানে শিলং থেকে অর্ডার এসেছে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু আপনি আমাদেরকে পাঠাবেন কি করে? আমি ওসিকে জিজ্ঞেস করলাম। বল্‌লেন, কেন বাই রুট মানে বাসে করে পাঠিয়ে দেবো! আমি বল্‌লাম তা হবে না। ওভাবে আমরা যেতে রাজী নই। আমাদেরকে বিশেষ কারে বা জীপে পাঠাতে পারেন, নতুবা আমরা দেশে ফিরে যাবো। বল্‌লেন, কেন? তাতে আপনাদের অসুবিধা কি? বল্‌লাম, একেতো মর্যাদার প্রশ্ন। সাধারণ যাত্রীদের সাথে কাঁঠাল বোঝাই হয়ে আমরা যাব এটা আমরা মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারছিনা। বিশেষতঃ যাত্রী বলতেই যখন এখানে কিছু মদ্যপ উপজাতীয়--যাদের ভাষাও আমরা বুঝিনা। দ্বিতীয়তঃ আমরা যে পোষাক পরিহিত। সুস্পষ্ট যবন, একটু ও নিজেকে আড়াল করার প্রয়াস নেই। যদি কোন ক্ষিপ্ত হিন্দু যুবক পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়? আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? বিশেষ করে ভারতে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার যে ছড়াছড়ি! কেউ আমাদেরকে পাকিস্তানের গুপ্তচরও তো ভাবতে পারে! অযথাই অনেক অবান্তর প্রশ্নের আমরা সম্মুখীন হতে চাইনা। ওসি আমার কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন। বল্‌লেন, হুবহু আপনার বক্তব্যটাই আমি উপরে উদ্ধৃত করবো।

অবশেষে সত্যি সত্যি শিলং থেকে জীপ এলো। পুলিশ বাহিনীর উর্ধতন কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছেন। ডাউকীকে গুডবাই জানিয়ে ওসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটি সরকারী জীপে আমরা দু'ভাই দু'জন পুলিশের প্রহরায় শিলং রওয়ানা হলাম। মামাকে বল্‌লাম, এবার আর আমাদের অসুবিধে হবে না ইন্‌শাআল্লাহ্‌। আপনি আমাদের অসুস্থ আব্বাকে গিয়ে খবর দেবেন, আমরা ভালই আছি। তিনি যেন আমাদের জন্যে দুশ্চিন্তায় না ভোগেন।

খরস্রোতা পাহাড়ী নদীতে খুটি যত শক্ত করেই দেয়া হোক না কেন, তার টেকার নিশ্চয়তা নেই। তাই ডাউকীর পুলটি রশিতে ঝুলিয়ে নির্মিত। এ পুলের কথা ছোটবেলা থেকেই খুব শুনে এসেছি। সেই পুলটি পার হয়ে আমরা খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে এগোতে লাগলাম। ক্রমেই জীপ উপরে উঠছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জীপ এত উপরে উঠলো যে, সিলেট শহর তথা আমাদের বাড়ীর এলাকা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। বর্ষাকালে বৃষ্টির পর যখন আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে, তখন সর্বদাই আমরা দূরের এ খাসিয়া পাহাড় দেখে এসেছি। আজ পাহাড়

থেকে আমাদের এলাকা দেখছি। কোন কোন স্থানে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাড়ী অতিক্রম করছিল তখন রাস্তায় পাশ এতই কম দেখা যাচ্ছিলো যে, যে কোন সময় গাড়ী একটু পিছলিয়ে হাজার হাজার ফুট নীচে গহ্বরে পড়ে যাওয়ার অজানা আশংকায় বুক দুরু দুরু কেঁপে উঠছিল। মেঘ পাহাড়ের গহ্বরসমূহে কুয়াশার আকারে জমে জমে এমনভাবে অনেক নীচে দেখা যাচ্ছিলো যেমনটি দেখেছি ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া বা চীন তথা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের পথে বিমান থেকে। নীচের দিকে চোখ পড়লে যাত্রী বেমালুম ভুলে যায়, সে বিমানে বসে আছে, নাকি স্থলপথেরই যাত্রী। দুপুর নাগাদ আমরা পাইনানসুলা নামক স্থানে পৌছলাম। ওখান থেকে পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল স্থান চেরাপুঞ্জীর দুরত্ব খবু বেশী নয় ১৫/২০ মাইল মাত্র। পাইনানসুলা পর্যন্ত পৌছে সেই চৈত্র মাসেও দাঁত শীতে ঠক ঠক করে বাঁজছিল। একথাটা আগে থেকেই জানা ছিল বলে শীতবস্ত্র আমরা সাথেই নিয়েছিলাম। সোয়েটার-মাফলার শরীর ও গলায় জড়িয়ে চাদর দিয়ে গা ঢাকলাম, কিন্তু তবুও শীতের তীব্রতা কম অনুভূত হচ্ছিলো না। পরবর্তীকালে চীনে ও মিসরে সাহারা ও গোবি মরুভূমির হাওয়া বাহিত তীব্রশীতের সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু তখন পর্যন্ত এত শীতের প্রাবল্য জীবনে কোনদিন অনুভব করিনি। পাইনানসুলা পাহাড়ী পথে একটা জংশনের মতো মনে হলো। ওখান থেকে চেরাপুঞ্জি, ডাউকী ও শিলং ছাড়াও আরও একটি পথ দেখলাম বলে মনে পড়ে। ওখানে জীপ থেকে নেমে আমরা যোহরের নামায ও চা-নাশতা সেরে নিলাম। তারপর আবার যাত্রা শুরু হলো।

সিলেট থেকে শিলং-এর দূরত্ব চুরাশী মাইল। ডাউকী পর্যন্ত ছয়ত্রিশ মাইল পথ আরো কয়েকবার অতিক্রম করে আমরা সীমান্তবর্তী পিকনিকস্পটে কয়েকবারই গিয়েছি। কিন্তু বাকী আটান্ন মাইলের অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। তাই পথে পথে রোমাঞ্চ ছিল, পুলক ছিল-যদিও দেশের পরিস্থিতি ও নিজ বাড়ীর এবং আত্মীয়স্বজনের অনিশ্চিত অবস্থার জন্যে মন দুশ্চিন্তা-পীড়িত ছিল। বিশেষতঃ বৃদ্ধ আব্বাকে আমরা শয্যাশায়ীই রেখে গিয়েছিলাম। দু দুটি পুত্রের বিরহে তিনি যে অনেকটা ভেঙ্গে পড়বেন, তা অনেকটা নিশ্চিতই ছিল। রাত আটটায় আমরা শিলং শহরের মেডিকেল হাসপাতালের সম্মুখে গিয়ে পৌছলাম। মেঘালয় পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মেহদী সাহেব তাঁর এস পি ডি-এস-পি কয়জনকে নিয়ে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। একজন মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অভ্যর্থনায় অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করলাম। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, বিছানাপত্র সাথে নিয়েছি কিনা। বললাম, কোন মতে প্রাণটা নিয়ে চষামাটির উপর

দিয়ে প্রায় ত্রিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে এসেছি, বিছানা পত্র আনবো কি করে? বললেনঃ উহ! এতই মারাত্মক অবস্থা ? আচ্ছা, চিন্তা করবেন না। জীপের ড্রাইভারকে বললেন, হোটেল পাইন উডে নিয়ে যাও। সেখানে রিসিপশনের জন্যে আমাদের লোকজন আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম হোটেল পাইন উডে। একটি পাইনগাছ পরিবেষ্টিত উঁচু টিলার উপর এ হোটেলটি। আমাদের তখনকার ঢাকার শাহবাগ হোটেলের সমমর্যাদার এই পাইনউড হোটেলের পর্দা, হোটেলের কাপ পিরিচে পর্যন্ত ও পাইন গাছের ছাপ মারা। সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশ। এ হোটেলেই ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে মেহমান ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও জওহর লাল নেহরুর মতো খ্যাতিমান নেতারা। আজ আমাদেরকে এ হোটেলে নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা আশ্বস্ত হলাম যে শেষ পর্যন্ত ওরা আমাদের মুল্যায়ন করতে পেরেছে।

পরের দিন সকালেই শুরু হলো আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ। আমাদের দু'ভাইকে দু'টি পৃথক পৃথক কক্ষে নিয়ে গিয়ে জেরা শুরু করা হলো। প্রথমে পরিচিতি পর্বেই অনেক প্রশ্ন। পিতামহ থেকে শুরু করে বাবা-মা, ভাইবোন, তাদের সন্তান-সন্ততি, কার বয়স কত ? সবই একে একে জিজ্ঞেস করে সাথে সাথে লিখে নেয়া হলো। মেহদী সাহেব পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল। তার সাথে এসেছে ডিব্রুগড়ের একজন হিন্দু বাঁদরমুখো ডিএসপি। তার কথাবর্তায় বেশ চোটপাট-ঔদ্ধত্য। মেহদী সাহেব বললেন—আস্তে,! বস মুসলমান বলেই তার সম্মুখে অমন চোটপাট করে কথা বলতে পারছে হিন্দু ডি-এস -পি। আই জিপির দুর্বলতাটুকু আমরা বেশ বুঝতে পারলাম। হিন্দু আই, জি, পি হলে ওকে ধমক দিয়ে শায়েস্তা করতো। বড়কর্তার সম্মুখে ছোট অফিসারের অত চোটপাট কি প্রকারান্তরে বড়কর্তাকে অবজ্ঞা করারই নামান্তর নয়? হিন্দু ভারতে মুসলমান কর্তাদের ঐ ভাবে মানিয়ে চলতে হয় বেশ বুঝা গেল। ছোট ভাইটি নিখিল পাকিস্তান ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান । সে শেখ মুজিব তথা আওয়ামী লীগের সহযোগী শক্তি। শীল-প্যাড, প্রমাণপত্র কিছু সঙ্গে আছে কিনা ওরা জানতে চাইলো। আমরা বললাম, প্রাণ নিয়ে পালাবার সময় কারো ও সব আনুষ্ঠানিক কাগজপত্রের কথা মনে থাকে ? আপনাদের কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, আমরা যেন রীতিমত প্রস্তুতি নিয়ে ভারতবর্ষ পরিক্রমায় বেরিয়েছি। মাঝে মাঝে আমি তীব্র শ্লেষাত্মক কথাও ছুঁড়ে মারি জিজ্ঞাসাবাদকারী পুলিশ ও গোয়েন্দা অফিসারদের প্রতি।

পাইন উড হোটেলে আমাদের দায়িত্বে নিযুক্ত ডি, এস, পি ভদ্রলোকটি হিন্দু

হলেও বেশ অমায়িক। কথাবার্তায় অত্যন্ত ভদ্র । আমার লেখা দু একটি গান ও কবিতা তাকে শুনিয়েছিলাম। তিনি তার খুবই সমজদার শ্রোতা দেখলাম। মাঝে মাঝে বিকেলে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে চা-পানে আপ্যায়িত করতেন। বলতেনঃ 'you are a graeat poet indeed.' একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম; আপনি কি আমাদের এ কবিতা ও গানের অর্থ বুঝেই বলছেন, না এমনিতেই আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রশংসা করছেন ? বললেন ঃ না, প্রকৃতই আপনি একজন কবি। আমি অন্তর থেকে আপনার প্রশংসা করছি। আর বাংলা তো আমাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী ভাষা। শব্দভাণ্ডার এবং বর্ণমালা প্রায় সমান সমানই। তাই বাংলা গান বা কবিতা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়না। একদিন দুদিন করে বেশ কয়েকদিন আমাদের কাটলো পাইন উড হোটেলে। কিন্তু আমাদেরকে দিল্লী বা কোলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কোন উদ্যোগই লক্ষ্য করলাম না। অথচ আমাদের ইচ্ছে ছিল ভারতের রাজধানীতে পৌছে বিশ্ব-সমাজকে প্রেস-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্তচীৎকার আমরা শুনাবো। এমনি সময় একদিন দিল্লীর সম্ভবতঃ ইণ্ডিয়ান টাইম্‌স-এ ২৭শে মার্চ ও তার পরবর্তী ঢাকার মিলিটারী অপারেশনের বিস্তারিত বিবরণ জনৈক ঢাকাবাসী আইনজীবির নামে প্রকাশিত হলো। আমরা দেখলাম, আমরা যে সব কথা প্রচার করবো বলে মনস্থ করেছিলাম, তার প্রায় সবকথা হুবহু পত্রিকায় বেরিয়ে গেছে। আমি সেদিন সেই বন্ধুভাবাপন্ন আমার কবিতা ও গানের ভক্ত ডি-এস-পিকে বললাম, ঐ দেখুন, অন্যে দাও মেরে দিল ।ঠিক এই কথাগুলোই আমরা নিজেরা প্রচার করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা অসমীয়রা আমাদের কথার মূল্য দিলেন না। পশ্চিম বঙ্গ সীমান্তের দিকে না গিয়ে কেন যে পূর্ব সীমান্তের এই বন-বাদাড়ের দেশে এসে পৌছলামঃ তিনি বললেনঃ দাদা, আপনি দেখছি আমাদের মর্মে আঘাত করেছেন। বললাম, আমরাও তো গভীর মর্মবেদনা থেকেই কথাটি বলছি। বললেনঃ আপনার ব্যথাটা অন্যে না বুঝলেও আমি বেশ বুঝি। সত্যি , আপনার মধ্যে একটা মানবতাবাদী দরদী অন্তর রয়েছে। যাদের নিজেদের অন্তর নেই, তারা এর মূল্য বা কদর বুঝবে না।

শিলং পুলিশ বা গোয়েন্দা যতই জিজ্ঞাসাবাদ করুক না কেন, আসল গোয়েন্দার হাতে কিন্তু আমরা পড়েছিলাম ডাউকিতেই । ওরা ছিল ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার লোক। ওরা আমার অনুজ মওলানা জালাবাদীকে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, ভারতের একটি বিমান 'গংগা' হাইজ্যাক করে যখন লাহোরে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন সে বিমান হাইজ্যাক সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ছিল ? বলাবাহুল্য, পশ্চিম

পাকিস্তানে ভুট্টো নিজে বিমান বন্দরে গিয়ে হাইজ্যাকারদের সাথে করমর্দন করে তাদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে কেবল আমার ভাইটিই তাদের সে হাইজ্যাকের প্রতি জোর সমর্থন ব্যক্ত করেছিল। আওয়ামী লীগের সহযোগী শক্তি হিসাবে নীতিগতভাবে কাজটি তার পক্ষে সঠিক হয়নি। কিন্তু সেদিন সে ঐরূপ বিবৃতিই দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থাসমূহ মারফত তা প্রচারিতও হয়েছিল বিশ্বব্যাপী। ও চট করে একটা জবাব দিয়ে মুখ রক্ষা করলো ঃ আমি তখন মফঃস্বলে ছিলাম। আমার সহকর্মীরা দলীয় নেতা হিসাবে আমার নামে ঐ বিবৃতিটি প্রচার করে দেয়। গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ আবার প্রশ্ন করলেন, আপনি রাজধানীতে ফিরে গিয়ে তার প্রতিবাদ করেছিলেন ? সে বললো ঃ মশাই, পাকিস্তান সরকারের অধীনে যদি আমরা অতটুকু স্বাধীনভাবে ইচ্ছে মতো এ জাতীয় ব্যাপারের প্রতিবাদই করতে পারতাম , তবে আর আপনাদের দেশে পালিয়ে আসার প্রয়োজন হতো নাকি ? ঐ দেশের বাস্তব পরিস্থিতিও পরিবেশকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন ? তার এ পাল্টা প্রশ্নে ওরা দমে গেল। বাস্তবতার দোহাই ভারতীয় কেউটে গুলোকে দমিয়ে দিল দেখে আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ছোট ভাইটা শেখ মুজিব ও নেতৃবৃন্দের সাথে ঘুরে ঘুরে বেশ ম্যাচুয়েরিটি অর্জন করেছে দেখে মনে মনে খুশীই হয়েছিলাম।

শিলং এ তখন তীব্র ঠাণ্ডা পড়েছে। ওখানে অন্যান্য বছর টেপের পানি জমে যায় শুনলাম। কিন্তু এবার শীতের তীব্রতা নাকি অনেকটা কম। টেপের মুখে পানি জমছেনা। হোটেলের কক্ষে কয়লার হিটার রয়েছে। তাও এবার জালাবার প্রয়োজন হচ্ছে না। তবে সকালে আটটার আগে নতুন টাট্‌কা পানি না আসা পর্যন্ত ওযু গোসল খুবই কষ্টকর ছিল। তবুও সময় মতো ওযু করে ফজরের নামায পড়ে সঙ্গে নেয়া ছোট সাইজের থানবী (রঃ) এর উর্দু তর্জমাও হাশিয়া সম্বলিত কুরআন শরীফ তেলাওতে বসতাম। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এমন কি দিনের বেলায়ও এ কুরআন শরীফ খানাই ছিল আমার প্রধান সাথী। সারাদিন তেলাওতে কাটাই। কখনো আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কখনো সান্ত্রীদের সাথে আলাপ জমাই। সান্ত্রীদের মুখ থেকেই সর্ব প্রথম শুনলাম, পাকভারত যুদ্ধে ওরাই জিতেছিল, হার নাকি হয়েছিল আমাদের অর্থাৎ পাকিস্তানীদের। অথচ এর বেশ কয়েক বছর পর আশি সালের দিকে এসে প্রতিরক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী সুব্রমনিয়াম পঁয়ষট্টির যুদ্ধে তাঁদের সহজে পরাস্থ হওয়ার কথাটা স্বীকার করেছিলেন এভাবে যে, এখন আর পঁয়ষট্টির মতো এত সহজে পাকিস্তান ভারতকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবেনা। একটি বহুল প্রচারিত বিজ্ঞাপনে আমি

ভারতীয় মহলের এ পরোক্ষ স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। সান্ত্রীর কথা থেকে বুঝলাম, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যুদ্ধজয়ের মিথ্যা খবর এমন কি চীনের সাথে তাদের যুদ্ধের পরাজয়ের সময়ও প্রচার করে তাদের নিজ দলীয় সৈন্যদল ও জনসাধারণের মনোবল রক্ষার চেষ্টা সফল ভাবেই চালিয়ে গিয়েছিলেন।

পাইন উড হোটেলে একদিন কুরআন শরীফ তিলাওত করছি। হোটেলের খানসামা বৈকালিক চা-নাশতা নিয়ে রুমে প্রবেশ করলো। বয়স পঞ্চাশোর্ধ। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এক বিশেষ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস নিলো। বুঝলাম, মনের গহীনে কোন এক অব্যক্ত বেদনা তাকে পীড়া দিচ্ছে। আমি তিলাওত বন্ধ করে তার দিকে মনোনিবেশ করলাম। জিজ্ঞেস করলামঃ এমন করে আমার দিকে তাকানো হচ্ছে কেন ? জবাবে সে জানালো ঃ কভি ইস্‌সে হামারা ভী তাআল্লুক থা হুযুর ! (-এক সময় আমাদেরও এর সাথে সম্পর্ক ছিল হুযুর !) বলে সে কুরআন শরীফের দিকে ইঙ্গিত করলো। আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। তা হলে আপনিও মুসিলম ? আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। বললে, জ্বী, মেরা নাম লতীফ হ্যাঁয় ! ঘর ? কানপুর থা (কানপুরে ছিল)। তারপর সে যা বললো, তার নির্গলিত অর্থ হলো ঃ সে এখন প্রায় ক্রীতদাস। হোটেলের গাড়ী নিয়ে বাসা থেকে নিয়ে আসে। আবার দিনান্তে বাসায় ফিরিয়ে দিয়ে আসে। স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। তাই নিজের দ্বীনধর্ম, আকীদা-বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-আচরণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি জীব-জানোয়ারের জীবনই তাকে কাটাতে হচ্ছে। এর থেকে মুক্তিরও কোন উপায় সে দেখছেনা। হোটেল পাইন উডে আমাদের পর পরই এসে শামিল হলেন আবদুল মজিদ নামক একজন শিক্ষিত রুচিবান ভদ্রলোক। বাড়ী ফরিদপুরে। তাঁর পোষাক-আশাক, মূল্যবান থ্রী-ইন-ওয়ান, এবং কথাবার্তায় তাঁকে উচ্চশিক্ষিত ও রুচিবান বলেই বুঝা যাচ্ছিলো। সম্ভবতঃ এখন তিনি ব্যাংককে আছেন। যতদূর মনে হয়, সি-এস-পি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা। তিনিও চাকুরী করলে জয়েন্ট সেক্রেটারী ডেপুটি সেক্রেটারী একটা কিছু থাকতেন এরূপ একটা প্রতীতি তাঁর সম্পর্কে আমাদের জন্মেছিল। শেখ মুজিবের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যও তিনি পেয়েছিলেন বলে পরবর্তী কালে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন। ঢাকা থেকে "আল-তবারক" নামে একটা সঙ্কলনও তিনি পরবর্তীকালে বাবুবাজার রুবী প্রেস থেকে ছেপে প্রকাশ করেছিলেন আর একজন ঢাকার শাখারী পট্টির শক্তি নামের এক যুবক। হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে সে নাকি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন। শাখারী পট্টির নরুল ইসলাম (ইউনিয়ন

আওয়ামী লীগ কর্মকর্তা) স্বর্ণকারের ঘনিষ্ট বরং তারই কাছে প্রতিপালিত তার ছোট ভাইয়ের মতো। যুবকটি চেহারা ছুরতে পাহলোয়ানের মতই ছিল। এ দুজন ছাড়াও কয়েক দিন পরে কালিয়াকৈরের শামসুল হক সাহেব (আওয়ামী লীগ সরকারের পরবর্তীকালের পাটমন্ত্রী) তাঁর একজন সঙ্গীসহ পাইন উড হোটেলে এসে আমাদের সাথে শামিল হলেন। এঁর সাথে আমার অনুজ মওলানা জালালাবাদীর পূর্বেই ঘনিষ্টতা ছিল। খাওয়া দাওয়া চা-নাশতা আমাদের একত্রেই চলতো। শিলংএর হোটেলে তিনি আমাদেরকে দেখে আর আমারা তাঁকে দেখে অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এখানে কেমনে আসলেন ? আমরা বললাম, এটাই তো আমাদের সিলেট সীমান্তের নিকটবর্তী উল্লেখযোগ্য ভারতীয় শহর? বললেন ঃ ওহ্ ঢাকা থেকে তাহলে বাড়ী হয়ে এখানে এসেছেন ? বললাম ঃ তাই! আমরা জিজ্ঞেস করলাম আপনি এখানে কি করে পৌছলেন ? বললেন ঃ আমাদের মোমেনশাহী থেকে উত্তরের গারো পাহাড়ের সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করি। পুরো গারো পাহাড়, খাসিয়া পাহাড় অতিক্রম করে কয়েকশ' মাইল পাহাড়ী উঁচুনীচু পথ জীপে চড়ে আসতে দেহের প্রতিটি জোড়া যেন খুলে গেছে! আমি একটু আস্বস্ত হলাম যে, শেষ পর্যন্ত আমার ভাইয়ের পরিচিত ও বিশ্বস্ত একজন সঙ্গী জুটলো। আমি বললাম, বেশ ভাল হয়েছে। আপনারা দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা একত্র হয়েছেন। এবার আমি নিশ্চিন্তে দেশে ফিরে যেতে পারি।

একে তো প্রায় এক পক্ষকাল পূর্বে বাড়ী ছেড়েছি। আসার সময় বৃদ্ধ আব্বাকে শয্যাশায়ী অবস্থায় রেখে এসেছি। মনে দারুন দুশ্চিন্তা ছিল। তদুপরি এমন আরেকটি ঘটনা এখন ঘটে গেল যাতে আর এখানে মন টিকতে চাইছিল না। দেখতে দেখতে শুক্রবার এলো। জুমার নামায শিলং-এর একটা বড় জামে মসজিদে পড়বো এরূপ একটা সাধ ছিল মনে। তাতে এখানকার মুসলমানদের সাথে মেলা মেশার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে সায় দিলেন না। তাতে নাকি টেকনিক্যাল অসুবিধা আছে! নামায আমাদেরকে হোটেলেই পড়তে হবে। ঠিক তখনই আমরা বুঝতে পারলাম, আসলে আমরা মেহ্মান নই, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দী। তাই হোটেলের বাইরে কোথাও যাওয়া আমাদের জন্যে মানা। মুসাফির হিসাবেই জুমা আমাদের জন্যে জরুরী নয়। বন্দী হয়ে থাকলে সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। তাই আমরা আর উচ্চবাচ্য করলাম না। কিন্তু বেঁকে বসলেন আব্দুল মজীদ সাহেব। এমনিতে তিনি নামাজের কোন ধার ধারেন বলে মনে হয় না। কিন্তু ওঁরা নামাজ পড়তে বাধা দেবে কেন, এটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না;

তিনি এটাকে আমাদের ঈমানের দুর্বলতা বলেই ধরে নিলেন। পরবর্তীকালে চুয়াত্তর সালের দিকে যখন ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে না অন্য কোথাও তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, তখন প্রথম দেখাতেই তিনি আমাকে সে কথাটি বলেছিলেন। কিন্তু আমি যে তাঁকে ফিরে বলবো, শরীয়তের মাস্‌আলা অনুসারে আমাদের সেখানে করণীয় কিছুই ছিলনা, কারণ, আমরা একে তো প্রবাসী, দ্বিতীয়তঃ কাফেরদের হাতে আমরা বন্দী ছিলাম; সে টুকু শুনবার ধৈর্যটুকু পর্যন্ত তাঁর ছিল না। এক ধরনের লোক নিজে থেকেই একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকে আর সে ভুলটা কেউ ভাঙ্গিয়ে দিক একথাও তারা বরদাশত করতে রাজী থাকে না। আমাদের সেদিনকার পাইনউড হোটেলের সে সহঅবস্থানকারী বন্ধুটি হচ্ছেন ঐ পর্যায়েরই লোক। কোন যুক্তি বা শরীয়তের মাস্‌আলা সেখানে আবেগের নীচে চাপা পড়ে যায়।

দেখতে দেখতে পয়লা বৈশাখ এসে গেলো। সে দিনটিকে যে আসামবাসীরা এত তাৎপর্য্যপূর্ণ মনে করে, তা আগে কল্পনাই করতে পারেনি। "বিহুর পূজা" হয় সেদিন। একেবারে আমাদের ঈদুল ফেতরের মতো। ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসব। রকমারি খাবার ও মিস্টান্নাদির ছড়াছড়ি। পত্র পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র বা বিশেষ সংখ্যা। রেডিও টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান। আমাদের জন্য অবশ্য রেডিও টিভির ব্যবস্থা ছিলনা। মজিদ সাহেবের থ্রী-ইন-ওয়ান আমাদের সংবাদ-পিপাসা মোটামুটি মিটিয়ে যাচ্ছিলো।

বিহুর পূজার দিনে আমাদের জন্যে ডবল খানা মানে গোশতের পরিমাণ দ্বিগুণ এলো। আমাদের মধ্যে শক্তি হিন্দু, তাই, তার তাতে খুশীই হওয়ার কথা। মজিদ সাহেব সেকুলার টাইপের মুসলমান। তাই তাঁরও কোন অসুবিধে দেখা দেওয়ার কারণ ছিল না। কিন্তু আমরা তো কেবল মুসলমানই নই একেবারে গোড়া মুসলমান তথা মুসলিম জাতির ধর্মীয় মুলবোধ রক্ষার জিম্মাদার-আলেম। তাই আমাদের অনেক বাছবিচার করে চলতে হয়। পূজার কনসেশান গ্রহণে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত। তেমনি গোশ্‌ত হলেই আমরা খেতে পারি না, তলিয়ে দেখতে হয়, এটা হারাম, না হালাল, সঠিক পদ্ধতিতে জবাইকৃত, নাকি যন্ত্রের সাহায্যে মারা বা যেন তেন করে যে কারো হাতে জবাই করা পশুর গোশ্‌ত। আল্লাহ্‌র নামে কোন মুসলমান কর্তৃক জবাই করা না হলে আমাদের জন্যে তা খাওয়ার সিদ্ধ নয়। তাই খাওয়া টেবিলে আমরা দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লাম। শক্তি দাঁত খিচিয়ে যা বললো তাঁর নির্গলিতার্থ হলো, এই মুসলমানীর তেজে সীমান্ত পেরিয়ে এপারে এসেছি,এখানে এসেও দেখছি মুসলমানীর উৎপাত থেকে বাঁচতে পারলাম না।

আমি বল্লাম, শক্তি, তোরা হচ্ছিস জীব- জানোয়ারের মতো, দুনিয়ার সবকিছুই তোদের জন্য হালাল মনে করিস, একেবারে যাকে বলে সর্বভুক। কিন্তু আমাদের হাত পা যে বাঁধা ! আমরা কেবল হালালটা খেতে পারি, হারামটা ছেড়ে দিতে হয়। নে ভাই, ডবল গোশতের পেয়ালা, আমাকে তোর ডালের পেয়ালাটা দিয়ে দে। আর ভারতে এসেছি বলে যে নিজের দ্বীনধর্ম ছেড়ে দিয়ে তোদের মত জীব হয়ে গেছি, এরূপ ভাববারও কোন কারণ নেই। শিলং তো শিলং, গয়া-কাশী বৃন্দাবন বা হরিদ্বারে গেলেও, মুসলমান মুসলমানই থাকে। কাফের হয়ে যায় না। বুঝলি ? আমার জবাবটা তার জন্যে প্রীতিকর না হলেও অফারটা রীতিমত সুখদায়ক ছিল। শাখারী পট্টির হিন্দু পাহলোয়ান গোগ্রাসে দু'দুটো ডবল পেয়ালা খাশী গিলতে লাগলো। অগত্যা আমার অনুজটিকে সম্ভবতঃ অগ্রজের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে ডাল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। অবশ্য, ডালটাও বেশ সুস্বাদুই ছিল। কারণ, এতে বেশ ঘিয়ের আমেজ বর্তমান ছিল।

এরই মধ্যে একুশে এপ্রিল তারিখটি মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি ইকবালের মৃত্যুদিবস হচ্ছে এ তারিখটি (১৯৩৮ ইং)। তাঁর এ মৃত্যু দিবসে নানা ভাবনা এসে মনের কোণে ভিড় করলো। অনেকে পাকিস্তানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইকবালের প্রতিও বীতশ্রদ্ধভাব প্রকাশ করেন। আমি কিন্তু সে দলে নই। ইকবালের মতো একটা বিশ্ব-প্রতিভাকে শুধু পাকিস্তানের হিস্‌সায় ছেড়ে দিতে আমার মন একেবারেই নারাজ। আর তাঁর অপরাধটাই বা কী ছিল ? তিনি তো বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সাথে রেখে চিন্তা করেন নি ! তাঁর ১৯৩০ সালের এলাহাবাদ ভাষণে যখন প্রথম পাকিস্তানের ধারণা তিনি ব্যক্ত করেন, তখন কেবল উত্তর পশ্চিম ভারতের মুসলমানদেরকে নিয়ে একটা মুসলিম রাস্ট্র গঠনের কথাই তিনি বলেছিলেন। আমাদের তথা পূর্ব পাকিস্তানের (আজকের বাংলাদেশের) কথা তো তিনি এমন করে ভাবেন নি ! এতদিন তাঁর উপর একটা রাগ ছিল এজন্যে আমার। কিন্তু এটা যে বাস্তবে হবার নয়, তাই ইকবাল আমাদেরকে নিয়ে গোড়াতেই চিন্তা করেন নি। এটা তো তাঁর বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল ! তা আমাদের জন্যে যতই অপ্রিয় হোক , এতে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ নেই। ইকবাল আমাদের কে নিয়ে চিন্তা করেন নি। আর আমরাও ঐ পাকিস্তানে আর থাক্‌ছিনা বা থাকতে পারছিনা। তা হলে স্বাপ্নিক কবির দোষটা কোথায় যে আমরা তাঁর প্রতি রাগ দেখাবো ?

ইকবাল দিবস আসলেই কিছু লেখালেখি করেছি এবং তা জাতীয় পত্র

পত্রিকায় ছাপাতে দিয়েছি প্রায় প্রতি বছর। আজ শিলঙের হোটেলের কক্ষে আমরা বন্দী। বন্দী আমাদের চিন্তাধারাও। মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়াতে পারেনা সে।

বন্দীত্বের উপলব্ধি মনকে বিষিয়ে তুললো। তদুপরি অনুজের একাকীত্বও ঘুচে গেছে কালিয়াকৈরের আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল হকের আগমনে। আমরা যে অন্ততঃ পাকিস্তানের গুপ্তচর নই, একথা তো নিশ্চয়ই তাঁরই মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে। এছাড়া আমার তখনকার কবিতা ও গানগুলোর সমজদার শ্রোতা ডি, এস, পি ভদ্রলোকটিও নিশ্চয়ই যথারীতি আমার মন-মানসিকতা কর্তৃপক্ষের নিকট বিবৃত করে থাকবেন। তাই এখন আমার ভারতে থাকা মানে অযথাই একটা যবনের হিন্দু ভারতের অন্ন ধ্বংস করা। এদিকে শয্যাশায়ী অশীতিপর বৃদ্ধ আব্বা দেশের বাড়ীতে কি অবস্থায় রয়েছেন, বাড়ীঘর অক্ষত আছে কি না, এসব দুশ্চিন্তাও আমাকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল। তাই অনুজটিকে বলে আমি দেশে ফিরতেই মনস্থ করলাম। কর্তৃপক্ষকে তা জানাতেই তাঁরা দেখলাম একটা আস্ত যবনের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া। তাই কথাটা বলতেই মঞ্জুর হয়ে গেল এবং ২৮শে এপ্রিল তারা আমাকে একখানা জীপ দিয়ে ডাউকী সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন। প্রতিবাদকারী আব্দুল মজিদ সাহেবের কাছে কিছু বিদেশী মুদ্রা ছিল। তাঁকে নাকি পরে গুরুতর টর্চারিং করা হয়েছিল।

ফিরতির সময় আবার গোয়াইন ঘাটের সেই আত্মীয় বাড়ীতে এসে পৌছলাম। পাশের রাধাগঞ্জ চা-বাগান, যার মালিক ছিলেন আওয়ামী লীগ নেত্রী বদরুন্নেসার পাঞ্জাবী জামাতা ক্যাপ্টেন রশীদ সাহেব-সুদীর্ঘকাল সিলেটের ডিসি ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জনাব খুরশিদ সাহেবের অনুজ। তাঁর ম্যানেজার ও ছিলেন এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকই। অত্যন্ত নামাজী ও খোদাভীরু। এলাকার অতি উৎসাহী মুক্তিযোদ্ধারা শুধু রশীদ সাহেবকে খুন করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা পাঞ্জাবী সে ম্যানেজারটিকেও হত্যা করেছে। তাঁর ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। যুবতী মেয়েদেরকে অমানুষিকভাবে নির্যাতন করেছে÷এসব কথা ওপারে যাবার সময়ই শুনে গিয়েছিলাম। জনৈক অশিক্ষিত বন্দুকধারী মুক্তিযোদ্ধা ডাউকী বাজারে আমাকেও চ্যালেঞ্জ করে বসেছিল। আমরা যেহেতু দালাল ছিলাম না, তাই গলা সপ্তমে চড়িয়ে আমিও তাকে বেয়াদবীর জন্যে শাসাতে থাকি। সে জানালো, এ পোশাকের অর্থাৎ মৌলবী ধরনের আট জনকে ইতিপূর্বেই সে খতম করেছে। ইচ্ছে করলে এ মূহুর্তেই যে আমাদেরকেও খতম করে দিতে পারে, তাই সে বুঝাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের লীডার কে ? বললো ঃ তোতা মিয়া, মানে

জয়ন্তিয়া এলাকার নব-নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব হাবীবুর রহমান মরহুম। বললাম, আচ্ছা চলো তা হলে তোমাদের লীডারের সাথেই দেখা করি। সে আমাদেরকে নিকটবর্তী পাহাড়ী পুঞ্জীতে একটি বাড়ীর দিকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে চললো। আমরা আগে আগে হাঁটছিলাম, আর সে বন্দুক হাতে আমাদের পিছে পিছে আসছিল। সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজ এবং বর্তমান ডিগ্রী কলেজ এর পার্শ্ববর্তী তাঁর নিজ বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার সময় তাঁর একখানা পা ভেঙ্গে গিয়েছিল শুনেছিলাম। দূর থেকে আমাদেরকে দেখেই তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। প্রায় বিশ পঁচিশ গজ দূরে থাকতেই তিনি দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন খাসিয়া পুঞ্জীতে। ততক্ষণে উৎসাহী মুক্তিযোদ্ধাটির কলজে শুকিয়ে গেছে। তার ধারণা ছিল, আমরা হয়তো তার বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তার বিরুদ্ধে নালিশ করবো, কিন্তু আমরা তা করলাম না। তোতা মিয়া বললেন, আপনারা কেন অযথাই কষ্ট করে এই বন- বাদাড়ে এসেছেন ? বললাম, আপনি সংসদসদস্য বটে, জালালাবাদী মানে আমার অনুজটির নাম কি শত্রুদের কাছে কম পরিচিত, নাকি তার প্রাণের খৎরা আপনার চাইতে একটুও কম? আপনার খৎরা থাকলে কেবল নিজ এলাকায়, কিন্তু ওর খৎরা তো দেশজোড়া সবখানে। বললেন, তা ঠিক। বললাম, এজন্যেই তো অশীতিপর বৃদ্ধ পিতাকে মৃত্যুশয্যায় রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। তিনি তখন আমাদের ঘর ছাড়ার যৌক্তিকতা অনুধাবন করলেন। আমরা কোথায় আছি খবর নিয়ে চা-পানে আপ্যায়িত করে তিনি আমাদেরকে বিদায় দিয়েছিলেন। উৎসাহী বন্দুকধারীই আবার আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে চললো। লজ্জায় তখন তার অবস্থা কাহিল। বেচারা কথাও বলতে পারছিল না। আমি কেবল এতটুকু বললাম, এবার স্পষ্টই বুঝতে পারছো আমরা কারা। সাবধান, না চিনে কখনো কারো সাথে দুর্ব্যবহার করতে যেয়ো না। পোষাক দিয়ে সব সময় ভিতরের মানুষটাকে চেনা যায় না। পাঞ্জাবী- টুপী মানেই যে দালাল, এরূপ ধারণা একেবারেই মূর্খতাব্যঞ্জক। সে তখন আমাদের কাছে মাফ চেয়ে নিল। আমরা যে তার বিরুদ্ধে নালিশ করিনি এজন্যে, সে খুবই কৃতার্থ। নতুবা তার এজন্যে শাস্তিও হতে পারতো মনে হলো।

এ মুক্তিযোদ্ধাটির মুখে এবং অন্যান্য অনেকের মুখেই পাঞ্জাবী চা-বাগান ম্যানেজারের নৃশংস মৃত্যু, তাঁর বাড়ীঘর লুণ্ঠন ও পুড়িয়ে দেয়া, তার যুবতী ও কিশোরী মেয়েদের প্রতি নৃশংস অত্যাচার এবং বাগানের পশ্চিমা দুজন দারোয়ানকে হত্যা করে গোয়াইন নদীতে লাশ ভাসিয়ে দেয়া প্রভৃতির কথা শুনে

মনটা আমার বিষিয়ে উঠেছিল। তাই এ ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাবধান করে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম। কিন্তু কি ভাবে তা হতে পারে? ফেরার পথে সে সুযোগটাই আচমকা হাতে এলো।

সালুটিকর বিমানঘাটি থেকে গোয়াইনঘাঁটের দূরত্ব ৯/১০ মাইল মাত্র। বিমান ঘাঁটিতে সামরিক তৎপরতা জোরদার। ঢাকা-সিলেট বিমান উড়ছে ঘন ঘন। যে কোন সময় গোয়াইন ঘাট থানা সদরে সামরিক বাহিনীর হামলা হতে পারে সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত নিরাপদ করার স্বার্থে। তাই এলাকাবাসীরা আটাশটি গ্রামের লোকজনকে একত্র করে কোরআন শরীফ খতম ও দোয়ার মজলিসের ব্যবস্থা করেছে। প্রচুর লোক-সমাবেশ হবে সন্দেহ নেই। আমি ভাবলাম, আমার বক্তব্য প্রচারের এটা একটি মোক্ষম সুযোগ। যথাসময়ে মজলিসে হাযির হয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। ২৫/৩০ জন আলেমও আছেন মজলিসে। গণ্যমান্য মুরব্বীগণও উপস্থিত। স্থানীয় থানার অফিসার ইন-চার্জই (অ-সিলেটী) এলাকার সবচাইতে গণ্যমান্য সরকারী লোক। তিনি আবার মুক্তিবাহিনীর প্রধানও।

দেখতে দেখতে কোরআন খতম হয়ে গেল। কারণ, পড়বার লোক বেশী ছিল। মোনাজাত হবে একটার দিকে। এখনো যথেষ্ট সময় বাকী। আমি মস্‌জিদের ইমাম সাহেবকে বললাম, কিছু নসীহত করুন না লোকজনকে! বললেন ঃ নসীহত আমি জুম্মার সময়ে করি। বললাম, এখন লোকে কী করবে? তার চাইতে বরং কিছু কথা বলা যাক্! কিন্তু মৌলবী সাহেব কিছুতেই কিছু বলবেন না। বললেন ঃ আপনার বড় খায়েশ দেখছি ওয়াজ করবার। বললাম: হাঁ, তা-ই। বললেনঃ তাহলে আপনিই বলুন, আমি কিছু বলবো না।

আমি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ঢাকায় পাক বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের কথা বিবৃত করে তাদের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। এদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়াকে সমর্থন জানালাম এবং নিজ অধিকার রক্ষার জন্যে মরলেও শাহাদত নসীব হবে-সে কথাটাও বললাম। সাথে সাথে এ কথাও বললাম যে, কিন্তু অতি উৎসাহের ফলে যদি একটি মুসলমানও তোমাদের হাতে নৃশংসভাবে অন্যায় ভাবে নিহত হয়, তবে আল্লাহ্‌র গজব তোমাদেরকে গ্রাস করবে। তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চা-বাগানের পাঞ্জাবী ম্যানেজার ও দারোয়ানদের হত্যা ও বিনা জানাযা ও দাফনে লাশ পঁচতে দেয়ার জন্যে তাদেরকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করলাম। এসময় মৌলবী সাহেব এ বিপজ্জনক বক্তব্য প্রদানে আমাকে বাধা দিচ্ছিলেন পায়ে চিমটি কেটে সবার অগোচরে। আমি তখন তাঁকে

একটা ধমক দিলাম এই বলে যে, ‘যখন সারা দেশ জাহেলিয়াতের সয়লাবে ভেসে যাচ্ছিলো , তখন আপনারা দুজন মৌলবী দাঁড়িয়েও তো ওদের জানাজা পড়তে পারতেন মৌলবী সাহেব ! আপনারাও তো তা করলেন না ! মজলুমের আর্তনাদে এখানকার বাতাসও ভারী হয়েছে। আপনারাও সে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন বেঈমানের মতো। জীবন-মৃত্যুর মালিক ভেবেছেন ঐ বন্দুকধারীদেরকে। পাশেই সারিবদ্ধভাবে বসা থানার পুলিশ তথা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ইঙ্গিত করলাম। ‘অথচ ভয় করা উচিত একমাত্র আল্লাহ্কেই’। তারপর এলাকাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, ঐ বন্দুকধারীরা যখন এতবড় একটা অন্যায় করতে যাচ্ছিলো, তখন আপনারা এলাকাবাসীরা কেন বাধা দিলেন না এ অপকর্মে ? আপনারাই তো ডাল-চাল, গরু, বকরী, হাঁস, মুরগী পাঠিয়ে এদের সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন ! আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করবেন, নবীর ওসীলা ধরে দোয়া করবেন, আল্লাহ্র বান্দা ও নবীর উম্মতদেরকে বিনা অপরাধে হত্যা করে ? এ দোয়াও তিনি শুনবেন ভেবেছেন ? নিজেদের অপরাধের জন্য আল্লাহ্র দরবারে তওবা করুন আগে; তারপর দোয়া। লক্ষ্য করলাম, উপস্থিত লোকজন আমার বক্তব্যের যথার্থতা অনুভব করেছে। তেলের কড়াইতে নিক্ষিপ্ত কই মাছের মতো তারা বিব্রত বোধ করছিলো নিজেদের অপরাধের জন্যে। ঠিক সেই মূহূর্তে আমি বললামঃ আপনারা যদি এ অপরাধের কথা স্বীকার করেন, তবে আমি আপনাদের সাথে তওবায় শামিল আছি নতুবা এ দোয়া যে কবুল হবেনা এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনারা আল্লাহ্র গজবের প্রতীক্ষা করুন ! উপস্থিত জনতা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলো। আমি বললামঃ ইমাম সাহেব, এবার আপনি দোয়া করুন ! উপস্থিত সকলে আমাকেই মোনাজাত পরিচালনা করতে অনুরোধ করলেন। অগত্যা হাত তুললাম। প্রাণভরে কান্নাকাটি করলাম আল্লাহ্র দরবারে। মুহুর্মুহু ‘আমীন’ ‘আমীন’ শব্দে আল্লাহ্র আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠছিল। জীবনে বহু দোয়া করেছি। দোয়া করেছি মক্কা-মদীনা, মিনা-আরাফাতে দোয়া করেছি চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও মিশরে যাওয়ার সময় ৩৭ হাজার ফুট উপর দিয়ে আকাশপথে চলার সময় পৃথিবীর বুক থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মতো। কিন্তু সেদিন গোয়াইনঘাট নগর মসজিদ প্রাঙ্গনের সে মোনাজাত জীবনে আর দ্বিতীয় বার কোনদিন করতে পারবো কিনা জানিনা। প্রতিটি মানুষের চোখে সেদিন পানির ঢল নেমেছিল। প্রতিটি মোনাজাতকারীর অন্তর ডুকরে উঠেছিল। সেদিনের সে স্মৃতি জীবনে ভুলবার নয়।

তারপরই শিন্নী খাবার পালা। সর্বাধিক গণ্যমান্য ওসি সাহেব তথা মুক্তিযোদ্ধা প্রধানকে আমার সাথেই পাশাপাশি খেতে দেয়া হলো। শুনেছিলাম, ওসি সাহেব পূর্বেই ঘোষণা করে রেখেছিলেন, আমাদের টুকের বাজার এলাকার কোন লোক পেলে তিনি প্রকাশ্যে গুলি করে মারবেন। এজন্যে আমার আত্মীয়রা সেদিন ঐ দোয়ার সভায় যেতে আমাকে মানাও করেছিলেন। আমি জেদ ধরেছিলাম, থানার ওসি যখন এরূপ কথা বলেন, তখন আমার অবশ্যই সে মজলিসে যেতে হবে। আমি ওসি সাহেবকে তার সে ঘোষণার কথাটা জিজ্ঞেস করে বললাম, আমি কিন্তু ঐ টুকের বাজারের অধিবাসী। এবার আপনি আমাকে গুলি করে সে ঘোষণার বাস্তবায়ন শুরু করুন! ওসি সাহেব বেশ লজ্জায় পড়ে গেলেন। বললেন, হুযুর, ঐ এলাকায় পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে এবং গোটা এলাকাপাকিস্তানপন্থী, এ জন্যেই আমি এরূপ কথা বলেছিলাম। আমার নিজের মনেও এজন্যে যে ক্ষোভ ছিল না, তা তো নয়, তবুও আমি তাকে পরিস্থিতি বুঝাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, ওসি সাহেব, আপনারা সিলেট ছাড়া অন্য জেলার লোকেরা ঘুম থেকে উঠেই দেখেছেন ফ্ল্যাগ বদলে গেছে। পাকিস্তান হয়ে গেছে। কিন্তু সিলেটের লোকেরা এভাবে পাকিস্তান পায়নি। ঘরে ঘরে তাদেরকে এজন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে। শতকরা মাত্র ৫৪+৪৬ অনুপাতে তাদেরকে লড়তে হয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশী শিক্ষিত ও সচেতন হিন্দুদের বিরুদ্ধে। এসব সংগ্রামে ও মিছিলের পুরোভাগে ছিল টুকের বাজার এলাকার লোকজন। তাই পাকিস্তানের পতাকা ও আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম সিলেট জেলা কোর্টে উঠিয়েছিলেন এ এলাকার অধিবাসী উত্তর সিলেট জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশীদ সাহেব-আমারই চাচা। এ ছাড়া সামরিক জান্তার অত্যাচারের ভয়ে ভীত বিশাল জনতা সিলেট শহর থেকে আশ্রয় নিয়েছে এ এলাকায়ই। এখন তারা যদি পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে নিরাপদ থাকবার প্রয়াস চালিয়ে থাকে তবে এটা কি খুব অন্যায় হবে? যদি সালুটিকর থেকে মিলিটারীরা এদিকে মার্চ করে, তবে অপনিও উড়াবেন না পাকিস্তানী পতাকা? তখন তো সকলের আগে আপনিই স্যালুট মারবেন মিলিটারী অফিসারদের উদ্দেশ্যে! আমতা আমতা করে তিনি তা স্বীকারও করলেন। আমি বললাম, তাহলে এমন একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি আপনি কেমন করে করতে পারলেন যে, ঐ এলাকার লোক দেখামাত্র গুলি করবেন? যে লোকটির প্রতি আপনি গুলি নিক্ষেপ করবেন সে তো ঐ এলাকার একজন আওয়ামী লীগের কর্মী বা মুক্তিযোদ্ধা ও হতে পারে। বললেন ঃ হ্যাঁ, তাও অসম্ভব নয়। তাঁর এ স্বীকারোক্তির পরই আমি তাঁর সাথে বসে

শিরনী খেতে রাজী হলাম। ভালোয় ভালোয় মজলিস শেষ হলো। আমার আত্মীয়-স্বজনরা তথা মেজবান তরীকুল্লাহ্ ইর্শাদআলী ভাইয়েরা আমার [illegible]সিকতা ও সম্মানের জন্যে অত্যন্ত গর্বিত হলেন ।

এমনি সময় দেখি লণ্ডন ডিউজবারীতে বর্তমানে কর্মরত আমার সিলেট আলীয়া মাদ্রাসার সহপাঠী বন্ধু মওলানা আবদুল আযীয তাবলীগী জামাত নিয়ে সেখানে উপস্থিত। আমার বাড়ী ফেরবার আগেই ঐ এলকার প্রাক্তন সংসদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা নেতা জনাব হাবীবুর রহমানের হাতে আমার একটি পরিচয়পত্র লিখিয়ে নিয়েছিলাম। তবুও একাকী বাড়ী ফেরা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। যে কোন স্থানে অপরিচিত অতি উৎসাহী নব্য বন্দুকধারী মুক্তিযোদ্ধার গুলির নিশানা হয়ে যেতে পারি সে আশংকা পুরো মাত্রায়ই বিদ্যমান ছিল। দেশের ভদ্র লোকজন বা আলেম উলামারা পরেন লুঙ্গী-পাঞ্জাবী। অন্যরা শার্ট লুঙ্গি। আমার গায়ে একেবারে ঢাকায় ব্যবহার্য্য সেলোয়ার-পাঞ্জাবী। কেউ একজন বলেছিল, দাড়ি কেটে আপততঃ একটা সার্ট পরে চলেন না কয়েক দিন? জবাবে বলে, ছিলাম বেশ বদল করে এ ভয়াবহ সময়ে আপন পরিচয় গোপন করে মরতে চাইনা। যা আছি তাই হয়ে থাকবো আমরণ। বিজয় আসলে এভাবেই আসবে। বর্ণচোরার বেশে চলাকে আমি ঈমানের পরিপন্থী মনে করি।

দূরদর্শী উলামা: মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতার জন্যে সাধারণভাবে আলেম সমাজকে দোষারোপ করা হয়ে থাকে অথচ অনেকেই ভুলে যান যে, তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে কোন পশ্চিম পাকিস্তানী পরিষদ সদস্য ঢাকায় আসলে তার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেয়া হবে বলে ভুট্টোর হুমকি দেয়া সত্বেও মওলানা মুফতী মাহ্মুদ ও তাঁর দলীয় উলামা সদস্যগণ এবং মওলানা নূরানী যথারীতি ঢাকায় এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের এতদ্দেশীয় অনুসারী আলেমদেরকে এ দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে স্থানীয় ভাবে পলিসি নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ কারণে, জমিয়তপন্থী আলেমগণ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতার নিজেদের জড়ান নি !

হায় আবদুর রাজ্জাক ! আমার সিলেট আলীয়া মাদ্রাসার সমপাঠী আখালিয়া গ্রাম নিবাসী আবদুর রাজ্জাকের বাড়ীতে যখন হানাদার বাহিনীর হামলা হলো, তখন আবদুর রাজ্জাক বাড়ীর সকলকে অস্থির হতে মানা করে নিজে এ বিশ্বাসে হামলাকারীদের সম্মুখে এগিয়ে এলো যে, সে উর্দুতে তাদেরকে বুঝিয়ে দেবে যে, এরা নিরীহ পাবলিক, রাজনীতির লোক নয়। এমনি সময় ঘাতকের গুলি তাঁর বুক ভেদ করে চলে গেল। সে একটি কথা বলারও সুযোগ পায়নি। তার মৃত্য সংবাদে আমি খুব কেঁদেছিলাম। তার নব বিবাহিতা বধুটি বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই বিধবা হয়ে যায় ! সরল বিশ্বাসে এমনি হাজার হাজার সরল বিশ্বাসী আবদুর রাজ্জাক হানাদার জানোয়ারদের হাতে প্রাণ দিয়েছে। এদের সংখ্যা একান্ত কম নয়।

তাবলীগী জামাতের কাফেলায় শামিল হয়ে পড়লাম বন্ধুবর মওলানা আবদুল আযীযের দাওয়াতে। জামাতের অন্যতম মুরব্বী হাজী ইয়াকুব সাহেবের শ্বশুরবাড়ী ঐ এলাকায়ই। আমার সেই খতরনাক সত্য ভাষণের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন কিনা জানিনা। তার খবর কিন্তু রটে গিয়েছিল সর্বত্র। জামাতের সাথে পদব্রজে পুর্বদিকে অগ্রসর হয়ে যখন ১৫/২০ মাইল দূরবর্তী দরবস্ত বাজারে উপস্থিত হয়েছি তখন হঠাৎ হাজী সাহেবের দেখা। বল্লেন, শুধু একটা খবর দেয়ার জন্যেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমি এসেছি। আপনার সেদিনের বক্তৃতা এতই যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করেছিল যে মুক্তিবাহিনীপ্রধান তথা ওসি রীতিমত আপনাকে একটা বিপজ্জনক লোক ঠাউরিয়েছে। উপস্থিত সময়ে আপনার বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করার জো নেই ভেবে সে চুপ করেছে। কিন্তু ক্যাম্পে ফিরেই বলেছে, "কী খতরনাক মৌলভী তোমরা দেখলে তো! ওকে যেখানেই দেখবে সোজা গুলি করবে।" দেশে তখন আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই। কেউ কাউকে গুলি করে মারলেও বিচার করবে কে? বিশেষতঃ যদি মুক্তি বাবারা এ অপকর্মটি করেন তা হলে তো জানাজা পড়তেও কেউ সাহস করবে না! হাজী সাহেব এ খবরটি আমাকে জানিয়ে সাবধানে চলবার কথা বলে বেশ কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছেন। আমি তখন ওদের রাজত্ব ছেড়ে এসেছি। আল-কোরআনে এমনি পরিস্থিতিতে মূসা (আঃ) এর প্রতি উচ্চারিত শু"আইব নবীর অভয়বাণীটি দৃশ্যপটে ভেসে উঠলো। এক কিবতীকে এক ঘুষিতে অনিচ্ছাক্রমে খুন করে তিনি ফেরাউনের রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন মাদায়েনে। মূসা (আঃ) চল্ছেন আর চল্ছেন। প্রাণভয়ে তিনি এগিয়েই চলেছেন। পিছনে ঘাতকদল তাঁকে ধরবার জন্যে আস্ছে কিনা প্রতিনিয়ত এটাই ছিল তাঁর ভাবনা। শু"আইব নবী তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ "নাজাওতা মিন্ কাওমিয্ যালেমীন-- অত্যাচারীদের রাজ্য অতিক্রম করে আপনি বেঁচে এসেছেন। এটা অন্য রাজ্য।" বক্তব্যটি খতরনাক হলেও আমাদের মুক্তিবাহিনী প্রধান যে এমন একটা ফেরাউনী নির্দেশ দিয়ে রাখবেন তা আমি কল্পনাও করিনি। আর যখন তা জানতে পারলাম তখন আমি তাদের রাজ্যসীমা মানে গোয়াইনঘাট থানা অতিক্রম করে চলে এসেছি। আল্লাহর লাখ শোকর, মুক্তিবাবাদের যুক্তিহীন হত্যাকাণ্ডের শিকার আমাকে হতে হয়নি।

তারপর কানাইঘাটে পৌছে সেখানে শায়খুল হাদীস আল্লামা মুশাহিদ সাহেবের মাজার জিয়ারত করে এক রাত তাঁরই বাড়ীতে তাঁর অনুজ মওলানা মুযাম্মিল সাহেব মরহুমের আতিথ্য ভোগ করে গাছবাড়ী চুড়খাই হয়ে গোলাপগঞ্জ পর্যন্ত পায়ে

হেঁটে তারপর হঠাৎ একটা ট্রাক পেয়ে গেলাম ভাগ্যগুণে। ট্রাক ওয়ালাকে একটু অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে যখন সিলেট শহরের উপকন্ঠে কদমতলীতে পৌঁছলাম তখন চীনা রাইফেলধারী সম্পূর্ণ অপরিচিত চেহারার নবাগত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য পেটে রাইফেলের আগা দিয়ে এক খোঁচা মেরে সিলেট শহরে অভ্যর্থনা জানালো। বুঝলাম, মাস খানেকের মধ্যে অনেক উলট পালট হয়ে গেছে দেশে। মিলিটারী শাসন বেশ কঠোর ভাবে জেঁকে বসেছে। অবিশ্বাস বেড়ে গেছে। মিলিটারীর এত নিকটে আমি ঘেঁষে গেছি এটা রীতিমত খতরনাক। ওরাও এটাকে খতরনাক মনে করে। আমাদেরও তা-ই মনে করা উচিত। নইলে কমপক্ষে চীনা রাইফেলের একটা গুঁতো খেতে হবে আমার মত মুক্তিবাহিনীর নযরে খতরনাক মৌলবীকেও। মানে, আমরা মৌলবী হয়ে মুক্তি বাবাদের দৃষ্টিতে খতরনাক আর বাঙালী হয়ে পাকবাহিনীর দৃষ্টিতেও নাপাক। অপরাধ না করেও উভয় বাহিনীর দৃষ্টিতে আমরা অপরাধী। যুক্তির যেখানে বালাই নেই, শক্তিমান তার শক্তি দিয়েই অপরাধীর সংজ্ঞা নির্ণয় করে, সেখানে জীবন থাকে অনিশ্চিত। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস ও তার পরবর্তী দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ দেশের আলেম সমাজকে এ উভয় সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্যেই জীবন কাটাতে হয়েছে।

সিলেট শহরে পা দিতেই বন্ধু হেকীম আবুল হায়াতের সাথে দেখা। বললেন, জামাতী ও মুসলিম লীগাররা আমাদের বাড়ী ত্যাগের পর এমনি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, ঐ সময় বাড়ীতে থাকলে নির্ঘাৎ গুলি খেয়ে মরতে হতো। 'আপনার অশীতিপর বৃদ্ধ আব্বা আপনাদের দু'জনকে এক সাথে হারিয়ে আর এ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখে শারীরিক ও মানসিকভাবে একেবারে শয্যাশায়ী। তাঁর অবস্থাও আশঙ্কামুক্ত নয়। আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ী যান'--তিনি বললেন।

সালুটিকর বিমান ঘাঁটির পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে আমাদের মাথার উপর দিয়ে ঘন ঘন পাকবাহিনীর রসদ সরবরাহকারী বিমান অবতরণ করছিলো। দেখেই আমার মনে হলো একটা রাইফেল দিয়েও অনায়াসে বিমানটি ফেলে দেয়া যাবে। তথ্যটি মুক্তিবাহিনীর কাছে পৌঁছাতে হবে। এমনি সময় আমাদের পাশ্ববর্তী গ্রামের এমন একটি ছেলের সাথে দেখা, যাদের পাশের বাড়ীতে হেকীম সাহেবের দাওয়াখানা ছিল। জোশের বশে আমি তখন ভেবেই বসেছিলাম যে, বাঙালী মাত্রই মুক্তিবাহিনী সমর্থক আর গোটা বাঙালী তথা পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রই পাক-বাহিনী বিরোধী। অসহযোগ আন্দোলনের সময় পূর্বপাক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্ণর রূপে শপথ করাতে অস্বীকার করে গোটা বিশ্বের কাছে তখন

এ সত্যটাই তুলে ধরেছিলেন। তাই মুক্তি বাহিনীকে একথাটা জানাবার জন্যে বলতে আমি এ ছেলেটাকে বলে দিয়েছিলাম। কিন্তু হায়, আমার সে অসতর্ক মন্তব্যটাই যে আমার জন্যে প্রাণান্তকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাতে পারে, সে কথা তো একটি বারও চিন্তা করে উঠতে পারিনি ! ছেলেটি বাড়ী ফিরেই কথাটি শত্রু পক্ষের কাছে এমনি ভাবে রাষ্ট্র করে দিল যে, আমার তো বটেই হাকীম সাহেবেরও দেশের শত্রু হওয়ার জন্যে এটা যথেষ্ট ছিল।

ভাগ্যক্রমে ঐ সংবাদবাহক ছেলেটা ছিল মূর্খ–অশিক্ষিত। তাই হাকীম সাহেব প্রত্যুৎমতিত্বের দ্বারা আত্মরক্ষা করলেন। তিনি বললেনঃ জালালাবাদী সাহেবের মতো একজন জ্ঞানী লোক কি এমন বেঁফাস মন্তব্য করতে পারেন ? এটা নিছক শত্রুদের বানানো কথা। আমার পেটে জ্ঞান বস্তুটা খুব কম থাকলেও শত্রুমহলে কিন্তু সর্বদাই আমার জ্ঞানের স্বীকৃতি ছিল। তাই হাকীম সাহেবের বক্তব্যকে কেউ উড়িয়ে দিতে পারলো না। দ্বিতীয়তঃ প্রতিপক্ষরা ইতিপূর্বেই এলাকায় আমার ও আমার অনুজটির প্রতি ঈর্ষাগ্রস্ত শত্রু বলে পরিচিত ও স্বীকৃত হয়ে পড়েছিল। তাই বাহক–প্রচারিত ঐ সত্য কথাটিও ওদের মুখে প্রচারিত হতে দেখে কেউই তা বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। কিন্তু অন্যরা বিশ্বাস না করুক, তাদের জন্যে এটা ছিল একটা মোক্ষম অস্ত্র। এ ছাড়া থানা পুলিশ বা প্রশাসন তো তখন ঐ অতি–উৎসাহী ইসলামের খাদেমদের স্বপক্ষে। তাই লোকে বিশ্বাস করলো, নাকি অবিশ্বাস করলো, তাতে কিছু যায় আসে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে সিলেট শহর থেকে বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম। বিরহ–কাতর আব্বা আমাকে পেয়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আর বিগত উত্তেজনাকর দিনগুলোর কথা বিবৃত করলেন। সত্যিই মাত্র ক'টি দিনে তাঁর স্বাস্থ্যের ভীষণ পতন ঘটেছে। আমি ভারত থেকে ফিরে যে সত্যিই একটা খুব ভাল কাজ করেছি, তখন আমি তা উপলব্ধি করলাম।

আমার বাড়ী ফেরার কথা বিদ্যুৎগতিতে রাষ্ট্র হয়ে গেল। শান্তি কমিটির নেতা শাহ্‌পুর গ্রামের কসীরুদ্দীন সরপঞ্চ আমাকে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য সংবাদ দিলেন। আমি তাঁর মৃদু জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হলাম। যতদূর মনে পড়ে, আমি তাঁর কাছে তেমন গোপনীয়তা অবলম্বন না করে মোটামুটি ভাবে বলেই দেই যে, ছোট ভাইটিকে আমি শিলঙের পথে সীমান্ত পার করিয়ে দিয়েছি একান্তই প্রাণে বাঁচানোর তাগিদে। আমার ধারণা ছিল যে, অন্ততঃ মানবিক কারণে প্রতিবেশী ও

আবাল্য পরিচিত এ লোকটি ব্যাপারটিকে তেমন মারাত্মক বা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা বলে মনে করবেন না বা আমার ক্ষতির কোন চেষ্টাই করবেন না। কিন্তু আমার সে ধারণা সত্য প্রতিপন্ন হয়নি। শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে যথারীতি আমাদের দুভাইয়ের নাম উপরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। থানায়ও আমাদের দেশদ্রোহী তৎপরতার অভিযোগ যথারীতি দায়ের করা ছিল এবং এ কাজটিতে আমাদের নিকটাত্মীয়ও প্রতিবেশীরাই ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। এটাকে তাঁরা সরকারী আনুগত্য লাভের মোক্ষম পন্থা বলেই বিবেচনা করেছিলেন, নাকি ইসলামের খেদমত মনে করে ছিলেন তা বুঝা মুশকিল। তবে মুসলিম লীগের সিলেট জেলা সভাপতিরূপে গণভোটে সিলেটের পাকিস্তান-ভুক্তির পর পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে যিনি পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন আমার সেই চাচা মওলানা আবদুর রশীদ সাহেব মরহুম তাদের এ নোংরামী আদৌ পছন্দ করতে পারছিলেন না। অথচ মুসলিম লীগার বা পাকিস্তানপন্থীরূপে আমাদের বিরুদ্ধে কেউ খড়্গহস্ত হলে তাঁরই তাতে সবচাইতে বেশী অগ্রণী হওয়া উচিত ছিল। আসলে আদর্শ নয়, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ করাই ছিল ঐ সব পাকিস্তানপন্থী প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্য। মালেক -মন্ত্রীসভার সিলেটী মন্ত্রী, হোসায়ন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহচর ও সুদীর্ঘ কালের আওয়ামী লীগের সিলেট জেলা-সভাপতি জনাব জসীমুদ্দীন এডভোকেট নিজে তৎকালীন সরকারের একজন মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কোন কোন প্রতিবেশীকে আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের ঘৃণ্য তৎপরতার জন্যে তাদেরকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন ঃ এরা আমাদের রত্ন। যে দল বা মতেরই তাঁরা অনুসারী হোন না কেন, দেশবাসী ও এলাকাবাসীদের গৌরবই তাঁরা বর্ধন করবেন। সুতরাং তাঁদের নিজস্ব মতামতের জন্যে তাঁদের প্রাণের বৈরী হয়ে যাওয়া আদৌ কোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমরা আর এডভোকেট জসীমুদ্দীন মরহুম তখন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বাসিন্দা অথচ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী এডভোকেট সাহেবের মধ্যে মনের ঔদার্য্য ছিল। আমরা বাংলাদেশপন্থীরা কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সর্বক্ষেত্রে সে ঔদার্য্যের ও মহত্বের পরিচয় দিতে পারিনি। তাই সিলেটের সর্বজনমান্য মুসলিম লীগ নেতা আজমল আলী চৌধুরী ও ডাঃ আবদুল মজিদের মতো লোকেরা আমাদের পীর হাবীবুর রহমান সাহেবের মতো দায়িত্বশীল ও বিদগ্ধ প্রগতিশীল বলে পরিচিত নেতাদের চোখের সম্মুখেই পৈশাচিক ভাবে নিহত হয়েছেন আর তাঁদের লাশ দিনের পর দিন অবহেলিত ভাবে রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে। ডাঃ আবদুল মজিদ সাহেব আশ্রয়ের খোঁজে তাঁর খালা পীর হাবীবুর রহমানের মায়ের কাছে তখন

ছুটে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হন।

গ্রামের বাড়ীতে কয়দিন অবস্থান করেই আমার মন অস্থির হয়ে উঠলো। এভাবে একার জীবন কাটিয়ে তো আমি আদৌ অভ্যস্ত ছিলাম না। লোকজন শহরে বসবাসকে নিরাপদ বিবেচনা করেনা বিধায় গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সকলে ভিড় করেছে। সকলের মনই তখন ভীতি বিহ্বল আর এই ভীতিবিহ্বলতার জন্যেই অনেকটা আল্লাহ্‌মুখী। আল্লাহ্ রসূলের কথা বললে লোকে মোটামুটি শুনে। এদিকে ছোট ভাইটি যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ভারত প্রবাসী, তাই শত্রুরা যে কোন সময় আমার বিরুদ্ধে ফন্দী আঁটতে পারে। ছোট ভাইয়ের নামে প্রচারিত জ্ঞানগর্ব পুস্তক পুস্তিকা ও বিবৃতি গুলো আসলে আমারই লেখা- একথাও ছিল একটা ওপেন সিক্রেট। তাই একাধারে বেশী দিন বাড়ীতে থাকাও নিরাপদ নয়। আমি আমার অশীতিপর বৃদ্ধ আব্বাকে বলে রাজী করে তাবলীগের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম গন্তব্যস্থল ঠিক করলাম শায়খে-কাতিয়া হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন সাহেবের বাড়ী-জগন্নাথপুর থানার অন্তর্গত কাতিয়া। শেরপুর হয়ে কাতিয়া যেতে হয়। এদিকে খবর পেলাম, গাভুর টেকীর কর্মবীর ডাঃ মর্তুজা চৌধুরী সাহেব আমার নামধাম শুনে আমার সাক্ষাৎ চেয়েছেন। তিনি তখন জরাগ্রস্থ। বাইরে কোথাও যাওয়ার শক্তি নেই। খিলাফত আন্দোলন তথা বৃটিশ বিরোধী তাবত আন্দোলনে অগ্রণী ও বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে এমন কি সিলেটে বোমার মামলার আসামী হয়ে সেই বিশের দশকেই খিলাফত আন্দোলন কালে তিনি জেল খেটেছেন। বিপ্লবী হিসাবে তিনি সূর্যসেনের সাথেই তুল্য। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য যে, তিনি মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করায় সেই বিপ্লবী খ্যাতির যতটুকু তাঁর পাওনা ছিল ততটুকু তিনি পান নি। আমি গাভুরটেকীতে গিয়ে সেই বিপ্লবী পুরুষকে অন্তরের সশ্রদ্ধ সালাম জানালাম। তিনি আমাকে তাঁর বিগত দিনের অনেক বিপ্লবাত্মক কাহিনীই শুনালেন। তাঁর কাছ থেকে উপদেশ ও দোয়া নিয়ে পরদিনই আমি কাতিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাঁর সান্নিধ্য সত্যিই সেদিন উপভোগ্য ছিল।

শায়খে কাতিয়ার বাড়ীতে কয়েকদিন আতিথ্য ভোগ করে আমি তাঁরই পরামর্শ অনুসারে তাবলীগ জামাতের একটি দলের সাথে সৈয়দপুরে যাই। জামাতে যোগদান করতেই ঐ জামাতের আমীর সাহেব আমার হাতে আমীরের যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করে দিলেন। তাবলীগের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তখন আমার সঞ্চিত হয়। পথে পড়ে তাবলীগের ঘোর বিরোধী মওলানা ফুলতলী সাহেবের মুরীদদের লণ্ডনী গ্রাম ইসহাকপুর ও সৈয়দপুরের নিকটবর্তী ব্রাহ্মণপাড়া। এরা তাদের পীরের কাছে

তাবলীগ বিরোধী প্রচারণা শুনে ঘোর তাবলীগ বিরোধী। কিন্তু আমার কাছে তাবলীগের বয়ানাদি শুনে এঁরা এতই আকৃষ্ট হলেন যে, দুই গ্রাম থেকেই দু'টি জামাত তাবলীগে যোগদান করে। আমি সেদিন অনেকটা খেলামেলাই বলেছিলাম যে, তাবলীগী জামাতের অবস্থা হচ্ছে অনেকটা হকারদের মতো-বড় বড় দোকানদাররা তাদেরকে হিংসা করে। কারণ, নিজের পকেটের খেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এরা যেভাবে কালেমা-কালাম দোয়া-দরূদ মুসলমান সাধারণকে শিক্ষা দিচ্ছে তাতে মুরীদানের মুরগীটি খাশিটি আর ধানপাট ফসলাদি উশুলকারী পীর সাহেবদের ভয়েরই কথা। কথাটি লোকের মনে খুব লেগেছে মনে হলো। ইসহাকপুরে আমাদের প্রবেশকালেই গ্রামের এক শ্রেণীর লোক হাঁক দিয়ে গ্রামবাসীদেরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিলো, "পাঞ্জাবীদের দালালরা গ্রামে এসেছে! সাবধান!"

আমার সাথে সদ্য দশম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া বেশ কয়েকটি তরুণ ছিল।আমি তাদেরকে ইশারায় বললাম; এ জাতীয় আওয়াজ আমরা আদৌ শুনতে পেয়েছি বা এর কোন প্রতিক্রিয়া আমাদের মনে হয়েছে, তা কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয়া যাবেনা যিকিরে ফিকিরে পথ এগিয়ে যেতে হবে। তারা তাই করেছিল। পরে রাত্রে যখন তাবলীগের ছয় উসূল বর্ণনা করে আমি গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে বললাম, এবার আপনারাই বলুন, এ ছয় উসূলের কোনটি বাঙালীদের আর কোনটি পাঞ্জাবীদের? গ্রামের মাতব্বর সহ গ্রামবাসীদের অনেকের চেহারাই তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। গ্রামের মাতবর যতদূর মনে পড়ে আনফার খান সাহেব জোড় হাতে আমার কাছে এজন্য মাফই চাইলেন। আমি তাদেরকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে বললাম, তাবলীগের প্রচারিত ইকরামুল মুসলিমীন বা মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষায় যদি পাঞ্জাবীরা বিশ্বাসী হতো তা হলে আদৌ বাঙালীদের রক্তপাত হতো না। এ শিক্ষাটি সম্পর্কে উদাসীন থাকার দরুণই আজ মুসলমানের হাত মুসলমানের খুনে রঞ্জিত হচ্ছে! সুতরাং তাবলীগীদের পাঞ্জাবীদের দালাল হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা।

সৈয়দপুরে অবস্থানকালে একটা ছোটখাট সংকটেই পড়লাম। হযরত শাহ জালাল মুজার্রদে ইয়েমনী (রহঃ)-এর অন্যতম অনুসঙ্গী ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম পুরুষ হযরত সাইয়েদ শামসুদ্দীন (রহঃ) এর মাযার এখানে অবস্থিত এবং তাঁরই সাক্ষাৎ বংশধরদের অনেকেই এখানে বসবাসরত। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাইয়েদ আবদুন নূর (বর্তমানে সৌদী আরবে বসবাসরত) এ গ্রামেরই অধিবাসী এবং উক্ত বংশেরই তিনিও একজন। তাবলীগের খুসূসী দাওয়াত নিয়ে যখন আমি ওঁর

শ্বশুরবাড়ী (ঐ গ্রামেই) উপস্থিত হলাম তখন তাবলীগী রীতি অনুসারেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ডেকে আমার সম্মুখে নিয়ে আসা হলো। কিন্তু আমার মুখে কিছু উচ্চারিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বসলেন। বুঝলাম, আমার বন্ধুটির মাধ্যমে আমি তাঁদের সকলের কাছেই সুপরিচিত এক আকর্ষনীয় জামাই। এমন কি আমার লিখিত 'জীবন্ত মসজিদ সংগঠন" 'ইসলামের ডাক" প্রভৃতি বইও তাঁরা পড়েছেন। দেখতে দেখতে আমার চতুর্দিকে আপ্যায়নসমগ্রী এসে জমা হতে লাগলো। বন্ধুটি আমার জন্যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রস্তাবের সারমর্ম হলো, তাঁদের পরিবারে তিনটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। একটি আমার বন্ধুটির শ্যালিকা, একটি ফুফু -শ্বাশুড়ী অপরটি ওঁর আপন সহোদরা। প্রত্যেকের বিবরণও তিনি আমার কাছে খোলাখুলি পেশ করলেন। তাঁর বোনটি সুন্দরী, কিন্তু আমার মত 'সুশিক্ষিত" পুরুষের জীবনসঙ্গীনি হওয়ার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর নেই। শ্যালিকাটি শিক্ষায় ও রূপে গুণে চলনসই, ফুফু শ্বাশুড়ী গুণে -লাবন্যে অনন্যা, কিন্তু রূপসী তেমন নন। তাঁর দাদা শ্বশুর 'পণ্ডিত সাহেব" বলে এলাকায় সুপরিচিত অত্যন্ত ধার্মিক ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। চাচাশ্বশুর দু'জন বিলেতে থাকেন। একজন তখন বাড়ীতে উপস্থিত এবং আমার আপ্যায়নে অত্যন্ত মনোযোগী। সব কিছু বিবেচনা করে বন্ধুটির ফুফু শ্বাশুড়ীই আমার জন্যে উপযোগী ভেবে তাঁরা আলোচনা সে ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সাত-ভাই চম্পার মতো সাতভাইয়ের খুবই আদরিনী বোনটি আমার যোগ্য সহধর্মিণী হবেন, এটা তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয়। কিন্তু আমার মানসিক প্রস্তুতি বলতে কিছুই ছিলনা বলে আমি সবিনয়ে তাঁদের প্রস্তাবে সাড়া দিতে অসামর্থ জ্ঞাপন করি। সহোদর স্বাধীনতনার যুদ্ধে জড়িয়ে বিদেশ-প্রবাসী, বৃদ্ধ পিতা অসহায়ের মতো তার প্রতীক্ষায় রত। আমি প্রায় পলাতকের মতো বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শেষ পর্যন্ত মুখ খুলে আমি আমার অসামর্থের ও অপ্রস্তুতির কথা তাঁদেরকে বলতে বাধ্য হই। এমনকি পকেটের শেষ সম্বল পাঁচ টাকার এক খানা নোট দেখিয়ে বলি যে, এ টাকাটা শেষ হয়ে গেলে যে আমাকে কি করতে হবে, তা আমার জানা নেই। অথচ তখন বাস সার্ভিসও বন্ধ ছিল। যাই হোক, পণ্ডিত সাহেবের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর পরিবার পরিজনের আন্তরিক আপ্যায়ন আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। এলাকার বিভিন্ন মসজিদে তিনি তাঁর লণ্ডন প্রবাসী গুণধর পুত্র ধনটিকে দিয়ে ক্যারিয়ারে করে খাবার পাঠাতেন। তিনি নাকি তাঁর পুত্রদরকে বলেছিলেন, মওলানা সাহেব আমাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করুন আর নাই করুন, একজন আপন লোকের মতো সর্বদা তোমরা তাঁর

সাথে আচরণ করবে। সত্যি সত্যি তাঁদের সে আন্তরিকতা কোন দিন ভুলবার নয়। বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার পিতার কাছেও তাঁরা এসেছিলেন।

ছিরামিশী গ্রামেও আমরা বিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম। স্থানীয় কিছু লোক আমাদেরকে মানে তাবলীগী জামাতকে পাকিস্তানের চর ঠাউরিয়েছিল। এ সময় একদিন কুশিয়ারা নদীর তীরবর্তী রাণীগঞ্জ বাজার ও ছিরামিশী গ্রামে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা গেল। ৩ দিন পর্যন্ত এ আগুন জ্বলেছিল। এক দিনে রাণীগঞ্জে ১১৪ জন এবং ছিরামিশীতে ৭০জন লোককে লাইনে দাঁড় করিয়ে হানাদাররা হত্যা করল। মৃত-অর্ধমৃত লোক গুলোকে পিছন থেকে হাত বাঁধা অবস্থায়ই নদীর স্রোতে ওরা নিক্ষেপ করেছিল। তিন দিন পর নৌকা যোগে রাণীগঞ্জে গিয়ে আমরা এই পৈশাচিক হত্যার বধ্য ভূমিটি দেখে এসেছিলাম। একটি শ্মশ্রুধারী লাশ পানিতে পেয়ে আমরা রীতিমত জানাযা আদায় করে দ্রুত সেখান থেকে সরে এসেছিলাম।

তাবলীগ পর্ব শেষ করে আমি দেখলাম, বাড়ীতে বেকার অবস্থায় থাকা শত্রুদের সন্দেহকে দৃঢ়তর করবে। তাই উপস্থিত সময়ে একটা মুদির দোকান খুলে আমি বাজারে বসে গেলাম। লোকজনের সাথে শুধু শুধু চায়ের আড্ডা জমিয়ে দিন কাটালে কারো সন্দেহ হতে পারে যে লোকটি বুঝি আণ্ডার গ্রাউণ্ড কাজ করে যাচ্ছে। একটা কর্মব্যস্ত দোকানদার সম্পর্কে তো তা ভাবা চলবেনা। পাশের হায়দরপুর গ্রামের আবদুল হাই নামক একটি অতিভদ্র ছেলে ছিল আমার ব্যবসায়ের পার্টনার। আসলে সে-ই দোকানদারী করতো আর আমি ছিলাম লোকদেখানো পার্টনার। এভাবে কিছুদিন কাটানোর পর ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর সিমেন্টের চালান নৌকায় করে ঢাকা পাঠিয়ে ঢাকা থেকে প্রয়োজনীয় এটা ওটা কিনে সিলেটের আড়তে জমা দেয়ার ব্যবসাও কিছুদিন চললো।

এসময় সহোদর মওলানা জালালাবাদীর চিঠি মুজিবনগর তথা কোলকাতা থেকে বিলাত হয়ে বাড়ী পৌঁছতে প্রায় দেড়মাস সময় লেগে যেতো। বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে লোকজন আব্বার সাথে দেখা করলে আব্বা তাঁর ছোট ছেলেটির অনুপস্থিতিজনিত অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বলতেন আর আমাকে বলতেন, বাবা! এতদিন যখন গেছে আরো ক'টা দিন অপেক্ষা কর আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। জীবনের এ অন্তিম পর্যায়ে আত্মীয় স্বজনের কোলাহলটা থেকে একটু দূরে রয়ে একটু আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে চাই। সত্যি সত্যি এর মাত্র মাস দুয়েক পরেই আগষ্ট মাসে আব্বা ইন্তেকাল করলেন। তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও আমার কোলেই তাঁর

মস্তক ছিল। ছোট্ট ভাইটির অনুপস্থিতি তখন তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, আব্বার চেহারায় কোন দুশ্চিন্তার আলামতই লক্ষ্য করলাম না। আমি বললাম আব্বা, ওর জন্য একটু দোয়া করুন! দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে আব্বা আমাদেরকে বললেন ঃ আমার ছেলে ভালই আছে। দেশ স্বাধীন হবে। ও ভালোয় ভালোয়ই দেশে ফিরবে। তোমরা ওর চিন্তা করো না! তার জন্যে আমার মনে কোনই দুশ্চিন্তা নেই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আব্বা তাঁর স্বদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে যে ভাবে দোয়া করলেন আর তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী পুত্রের সম্পর্কে যে নিশ্চিত সুসংবাদ দিলেন, তা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে রইলো।

চিঠি দিয়ে ছোটভাইকে পিতার মৃত্যু সংবাদ পৌছানো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই এ সংবাদ প্রচারের জন্যে আমি পত্র-পত্রিকার আশ্রয় নিলাম। তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান (আজকের দৈনিক বাংলা) সহ কয়েকটি কাগজে এ সংবাদ বেরুলো। সত্যি সত্যি আমার সহোদরটি এ মাধ্যম থেকেই পিতার মৃত্যু সংবাদ যথাসময়েই পেয়ে গিয়েছিল।

নভেম্বর মাসে ঢাকায় এসে উস্তাদ প্রবর মওলানা অলিউর রহমান সাহেবের মুখে শুনলাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে তাঁরা রীতিমত উবায়দুল্লাহর কণ্ঠ শুনে আসছেন। পরে তাঁর মুখেই শুনেছিলাম যে, মুজিব নগরের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটির উদ্বোধনই হয়েছিল তার অর্থাৎ আমার সহোদর মওলানা জালালাবাদীর তেলাওয়াতে-কুরআনের মাধ্যমেই। দূরবর্তী সিলেট থেকে আমরা শুরুর দিকের অনুষ্ঠান গুলো শুনতে পেতাম না। অবশ্য, সংবাদ বুলেটিন ও চরমপত্র প্রভৃতি কথিকাদি শুনা যেতো অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজে। স্বাধীনতা উত্তর কালে বেতার কর্মীদের প্রকাশিত শব্দ সৈনিক নামক সংকলনে কিন্তু জালালাবাদীর নামটি চেপে যাওয়া হয়েছে। এটা অনিচ্ছাকৃত, নাকি উদ্দেশ্যমূলক, বলা মুশকিল।সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসের কথা। তখন একদিকে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো আমাদের টুকের বাজার স্কুলে জোরসে চলেছে রাজাকার ট্রেনিং এর মহড়া। জনৈক পাঞ্জাবী আর্মি অফিসার (যতদূর মনে পড়ে সুবাদার বা ক্যাপ্টেন ছিল) এ ট্রেনিং এর দেখা শোনা করছেন। আমার মনে এক দুষ্টবুদ্ধি চাপলো। গ্রামের ও এলাকার শান্তিবাহিনী ওয়ালাদের সম্মুখে নিজের ইমেজটাকে তুলে ধরে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং ওদের কুটনামী ও ঘ্যাচর ঘ্যাচর বন্ধ করার জন্যে আমি একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সালাম দিয়ে আর্মি অফিসারটির কক্ষে ঢুকলাম। খান সাহেবও আমাকে বেশ উষ্ণ আলিংগনে অভ্যর্থনা জানালেন। আমার মুখের উর্দু বুলি

মুহূর্তেই তার মনপ্রাণ কেড়ে নিল। তিনি আমাকে চা-পানে আপ্যায়িত করলেন। এদিকে বাইরে তখন শান্তিকমিটির স্থানীয় সেক্রেটারী (যিনি আমার আবাল্য শুভাকাংখী ও আপনজন বলে পরিচিত ছিলেন।) এ দৃশ্য দেখে জ্বলে পুড়ে মরছিলেন। তিনি ঝড়ের বেগে কক্ষে ঢুকে আর্মি অফিসারকে লক্ষ্য করে বললেনঃ এ হচ্ছে এলাকার এক নম্বরের মুক্তি, দেশের দুষমণ, ওর ভাই এখন ও ইণ্ডিয়ায় আছে! বলেই তিনি আমার ভাইয়ের সেই কবে শেখ মুজিবকে লেখা একটি পত্রের ফটোস্টেট কপি অফিসারের সম্মুখে তুলে ধরলেন। জামাতীদের গোয়েন্দা তৎপরতা যে এত শক্ত তা কোনদিন কল্পনাও করিনি। এখন আমার যেন সাক্ষাৎ যমদূতের সাথে মোলাকাৎ হলো! মূহুর্তে কলিজাটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কী! ওমন একটা সাক্ষাৎ প্রমাণের পর আমার আর কোন জবাবই ছিল না। বাইরে কৌতুহলী জনতা হায় হায় করে উঠলো! কি জানি এ মূহুর্তে অফিসারটি আমাকে গুলি করে দেয় নাকি!

এ স্কুলেই আমার হাতে খড়ি আর এ স্কুল থেকে আমিই সর্বপ্রথম প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় জালালাবাদ রেঞ্জের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্কুলের তথা এলাকার মুখ উজ্জল করেছিলাম। তাই বিগত কুড়ি বছর পর্যন্ত এলাকায় আমার নামে ধন্য ধন্য রব। অথচ এ স্কুল ঘরটিতেই একটু পরে আমার মৃতদেহ দেখা যাবে! আল্লাহ্‌র কী মর্জি, মাত্র কয়েক মূহুর্তের মধ্যেই আমিও কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। আমি বললাম খান সাহেব! ছদর ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দেশটাকে শান্ত করতে প্রয়াস পাচ্ছেন। তিনি চলে যাওয়া বাঙালীদেরকে ইণ্ডিয়া থেকে নিয়ে আসার জন্যে দিন রাত রেডিও টিভিতে অনুরোধ জানাচ্ছেন, অথচ এই শান্তি কমিটির লোকগুলো চায়না যে দেশে শান্তি ফিরে আসুক। ওরা চায় আরো দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলুক, আর ওরা আপনাদের বন্দুক দেখিয়ে দেশবাসীকে লুটেপুটে খাক। দেশবাসী আপনাদের ভয়ে এদেরকে টাকা পয়সা দেয়, আর মনে মনে আপনাদের শত্রু হয়। ঐ ব্যাটাদেরকে আপনারা শাস্তি দিতে পারেন না? আর দেখলেন তো, আপনার সাথে দু'টি ভালমন্দ কথা বলছি, কেমন করে লোকটি এসে বে-আদবের মতো ঘরে ঢুকে আমাদের আলাপটা মাটি করে দিল। আমার গুলি লক্ষ্য ভেদ করলো। তিনি হুম করে বন্দুকটি ঐ শান্তি নেতার দিকে তাক করে ধরে বললেন, বের হয়ে যাও, নতুবা এখনি তোমাকে গুলি করবো। বে-আদব কাহাকে? আর আমাকে বললন, মৌলবীজী সয়লাবকে ওয়াক্ত হাম্‌নে পেট কাটকে জও চান্দা দিয়া থা ইয়ে লোগ পাবলিক কো না দে-কর খোদ খায়া, হারামখোর কাহাঁকা। আমি

বললাম,ঠিক ধরেছেন 'খান সাহেব" এরাই সেই লোক।" ভালোয় ভালোয় সেদিন রক্ষা পেলাম। জনতা আমাকে বাহ্‌বা আর তাকে ধিক্কার দিল।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ মুক্তিযুদ্ধের আসন্ন বিজয় আগামীকালের সূর্যোদয়ের মত অবশ্যম্ভাবী মনে হচ্ছিলো। এমন সময় আমার মনে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপলো। শাহ্ ওলী নিয়ামতুল্লাহ কাশ্মীরী (রহঃ)-এর সাড়ে আটশ" বছরের পুরনো ফার্সী কতকগুলি কবিতার পংক্তি করাচীর বহুল প্রচারিত উর্দু দৈনিক জঙ্গ" প্রকাশিত হয়েছিল। তার একটি পংক্তিতে দুই ঈদের মধ্যবর্তী সময়ে একটা মহা অঘটন ঘটবার এবং তাতে মসুলমানদের ঘরে ঘরে নিহত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। কিন্তু তাতে হত্যাকারী হিন্দুজাতি এবং বিশ্বব্যাপী তার নিন্দার কথা উল্লেখিত হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণীই যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে একজন ওলীর তথা ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি হবে মনে করে আমি উক্ত পংক্তিগুলোর বাংলা পদ্যানুবাদ সিলেটের শাহ্‌জালাল প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছেপে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করি। উক্ত পংক্তি গুলোতে

মুসলমানদের নেতা হবে হিন্দুদেরই বন্ধু গোপন
সে তাহাদের করবে মদদ অবৈধ্ চুক্তি থাকবে যেমন"

কথাগুলোও ছিল। ব্যাপারটি যদিও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছিলামনা তবুও পুস্তিকাটি ছেপে দিলাম। সিলেট আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল দাদা-উস্তাদ বাহরুল উলুম মওলানা মুহম্মদ হোসেন নিজপাটী সাহেব তার জন্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মূলক বাণী দিলেন। কিন্তু সতর্কতার উদ্দেশ্যে তাতে তিনি কোন সই করলেন না। কয়েকদিন পর ফেনী থেকে প্রাপ্ত মওলানা নূর মুহম্মদ আজমী সাহেবের পত্রেও এর খুবই প্রশংসার কথা ছিল তবে তিনি এটাকে "খতরনাক উদ্যোগ" বলেই অভিহিত করেছিলেন।

এদিকে সিলেটের পূর্ব সীমান্ত থেকে মুক্তিবাহিনীর প্রবেশের সংবাদ পাওয়া গেল। আমি অতি আগ্রহে স্বাধীনতা আর সহোদরের আগমণ প্রতীক্ষা করছিলাম। বরইকান্দির রইসআলী (সিলেটের বর্তমান বাকশাল নেতা) নাকি কে একজন বল্‌লো, করীমগঞ্জে আমার ভাইটিকে দেখে এসেছে। পরে সহোদরটির মুখেই শুনেছিলাম ১৪ই ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল উসমানী একটি ডাকোটা বিমানে করে করীমগঞ্জের কুম্ভিগ্রাম পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন। ক্যাপ্টেন খালেক চালিত এ বিমানটির সহচালক ছিলেন ক্যাপ্টেন আকরাম। এ বিমানটিতে করে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডে জেনারেল ওসমানীর এডিসি লেঃ শেখ কামাল

এবং সুরঞ্জিৎসেন গুপ্ত ও সেদিন এসেছিলেন ; কিন্তু সীমান্ত নিরাপদ নয় দেখে আমার ভাইটি কোলকাতায় ফিরে গিয়েছিল।

পনেরই ডিসেম্বর আমাদের চরুগাও পয়েন্টে সিলেট-সুনামগঞ্জ- বাদাঘাট রাস্তার তেমুখীতে পাকিস্তান সমর্থক রাজাকার প্রহরীদের লক্ষ্য করে মর্টার নিক্ষিপ্ত হলো। মিত্রবাহিনী তথা ভারতীয় বাহিনী সুরমা নদীর অপর পারে অবস্থান গ্রহণ করেছে। ভারতীয় হেলিকপ্টার ওদেরকে সিলেট শহরের পূব পাশে নামিয়ে দিয়েছে। দুপুরে আগরতলা থেকে তাদের জন্যে সদ্য প্রস্তুত রুটি ভাজি প্রভৃতি সরবরাহ করা হলো দেখলাম। আমি যেহেতু এলাকার মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও স্বীকৃত তথা বিগত নয় মাসে বিড়ম্বিত ব্যক্তিত্ব, তাই আমার মনোবল আজ অনেক উর্ধে। তাই নিকটাত্মীয়রা সবাই বাড়ী ছেড়ে বন বাদাড়ে পালালেও আমি বুক টান করে ভারতীয় সৈন্যদের কাছে গিয়ে নিকট থেকে তাদেরকে প্রত্যক্ষ করলাম। রুশ বিমানে করে ভারতীয় পাইলটরা সিলেটের দস্তিদার বাড়ীতে অবস্থানরত পাক সেনাদের উপর উপর্যুপরি বোমা নিক্ষেপ করছে। এতকাল যাদেরকে বিধর্মী শত্রু জেনে এসেছি সেই ভারতীয়দের আঘাতে স্বদেশের মাটি পুড়ে খাক্ হচ্ছে দেখে মনে ভীষণ দুঃখ পাচ্ছিলাম। এদিকে নিকট থেকে ভারতীয় সৈন্যদেরকে দেখে মনে হলো, পাকিস্তানী সৈন্যদের সম্মুখে ওরা যেন বাঘের সামনে ভেজা শিয়াল ! স্বধর্মীয় সৈনিকদের অধঃপতনের জন্যে আজ তারা গায়ে গতরে যশ্ ও খ্যাতিতে ভারতীয়দের চাইতে অনেক গুণে সেরা হওয়া সত্ত্বেও তারা আজ শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হচ্ছে !

মাত্র মাস খানেক পূর্বে আমি যখন ঢাকা যাচ্ছিলাম, তখন জনৈক পাকিস্তানী সৈন্য আকবর খানের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। আমি উর্দুতে বলতে পারি দেখে সে নিজেই অনেকটা আপন বোধ করে কথা বলছিল। সে আমাকে দেশের সঠিক পরিস্থিতি কি জিজ্ঞেস করেছিল। আমি অকপটে বলেছিলাম, গোটা দেশের লোক তাদের শত্রু। যে কোন সময় দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে আর ওরা বেঘোরে মারা পড়বে। আকবর খাঁ বললো, কিন্তু আমরা যেদিকে যাই সেদিকেই তো লোককে পাকিস্তানী পতাকা ওড়াতে দেখি! বললাম ঐ এক খান পতাকা উড়িয়ে যদি তোমাদের পশুবৃত্তি থেকে লোক বাঁচতে পারে, তবে তাতে তারা কাপর্ণ্য করবে কেন ? বললো ঃ হ্যাঁ তাইতো। তারপর বললো আচ্ছা মৌলভী জী, আমরা তো দেশটাকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিচ্ছি, তবে লোকে আমাদেরকে শত্রু ভাবে কেন ? বললাম ঃ শত্রু না হলে তোমরা নিরীহ মানুষের বুকে গুলি চালাও কি করে ? মা-

বোনের উপর অত্যাচার কর কি করে ? বললো, মৌলভী জী, ও রকম সকলে করে না। বললাম, যারাই ঐ অপকর্মগুলো করে তাদের খাকী পোশাক, তোমারই গায়ের পোশাকের মতো। তাই ঐ পোশাকটি এখন বাঙালীরা মনে প্রাণে ঘৃণা করে। বললো, তা হলে হিন্দুস্থানের কাফের সৈন্যরা কি আপনাদের বেশী আপন নাকি ? বললাম, তা হয়তো নয়, কিন্তু ওরা তো আমাদের মানুষকে গুলি করছেনা, মা-বোনকে অত্যাচার করছেনা ! বরং তোমাদের অত্যাচারে ওদের দেশে আশ্রয় নেয়া এক কোটি লোককে তারা খাবার দিচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে ! স্বধর্মের স্বজাতির খুনী থেকে বিজাতীয় আশ্রয়দাতাকেই কি লোকে আপন ভাববেনা ? সে বললো, তাই তো ! এবার সে বিনীত ভাবে তাদের এখন কি করণীয়, আমাকে জিজ্ঞেস করলো। কথাগুলো আমি সহজবোধ্য উর্দুতে এমনভাবে বলেছিলাম যে, রেলের কম্পার্টমেন্টে বসা সহযাত্রীদের অনেকেই তা বুঝতে পারছিল। প্রথমে সহযাত্রীরা একটা খান সেনার সাথে আমার আলাপচারিতাকে মোটেই সুনজরে, দেখছিল না। কিন্তু যখন দেখলো আমি নির্ভয়ে এমন সব কথাই বলে যাচ্ছি যা তাদেরই প্রাণের কথা, তখন সকলেই আমার কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনতে শুরু করলো। আমিও রীতিমত উৎসাহিত বোধ করছিলাম। আমি বললাম, আকবর খান, এখন তোমাদের একটিই করণীয়, যেখানে যত বাঙালী পাও, তাদের হাতে পায়ে চুমু খেয়ে বলবে, না বুঝে আমরা মারাত্মক অপরাধ করে বসেছি, ভাই তোমরা আমাদেরকে মাফ করো ! তোমরা যে অন্ততঃ তোমাদের অপরাধটুকু বুঝতে পেরেছো এটুকু বুঝতে পারলেও লোকে কিছু সান্ত্বনা পাবে। শায়েস্তাগঞ্জ পেরিয়ে কোন এক স্টেশনে আকবর নেমে গেল। আর যাবার কালে সত্যি সত্যি আমার হাতে চুমু খেয়ে অঙ্গীকার করলো, সে আর কোন বাঙালীকে গুলি করবে না এবং কোন বাঙালীকে শত্রু ও ভাববেনা। আমি বললাম, আমার অনুরোধ, তুমি যখন তোমার ক্যাম্পে ফিরে যাবে, তখন আমার এ কথাগুলো তাদেরকেও বলবে এবং তাদের ভুলটুকু বুঝতে দেবে। সে বললো, মৌলভীজী, এটা আমি অবশ্যই তাদেরকে বলবো। কারণ, আপনি আমার সকল ধারনা একেবারে পাল্টে দিয়েছেন। ঐ সময়ে ইয়াহিয়া খান ইলেকশন দিয়ে ইলেকশনের কলাকল মত কাজ না করে ভুট্টোর প্ররোচনায় যে কী মারত্মক অন্যায় করেচেন, তা তাকে ভালমতে বুঝিয়ে বলি।

ঢাকা থেকে ফিরবার পথে সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা হলো। পাকবাহিনীর অনেক ধর্মীয় শিক্ষক পাঠান মৌলভী কোচে করে একই গাড়ীতে সিলেটের দিকে আসছিল। আমি একটু আলাপ চালাতে চেষ্টা করেই ব্যর্থ হলাম। সম্ভবতঃ খান মৌলভী

আমাকে সন্দেহ করেছে, অথবা বাঙালী গোলামের জাতি, ওদের সাথে আমার কথা কিসের এভাবটিই তাকে আমার থেকে আড়াল করে রেখেছিল। আমার এ আলাপ-প্রচেষ্টার জন্যে কোন কোন সহযাত্রী আমার উপর খুবই চটে ছিলেন। তাদের হাবভাবে তা বেশ ফুটে উঠেছিল। আমি যে শিলং ফেরতা একজন মুক্তি সংগ্রামী আর আমারই সহোদরটি স্বাধীনবাংলা বেতার উদ্বোধনকারী মওলানা জালালাবাদী, তা তো আর তাদের জানা নেই! আমিও সে পরিচয় ব্যক্ত না করে বললাম, কী আশ্চর্য, বেদ্বীন কাফেরদেরকে ভাই নয় বাপ বলতেও রাজী, কিন্তু কলেমা শরীক দ্বীনী ভাইকে ভাই বলে স্বীকার করা তো দূরের কথা ন্যূনতম মানবিক মর্যাদাটুকু দিতেও আমরা কুণ্ঠিত! এটা আর যাই হোক, সুস্থ মানসিকতা নয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের গোটা সময়টি ধরে এরূপ পরস্পরবিরোধী সংগ্রাম করে ষোলই ডিসেম্বর যেদিন স্বাধীনতার সূর্যোদয় হলো, সেদিন আমার ভাইটি কিন্তু সিলেটের আমাদের বাড়িতে ফিরে এলো না। এক অজানা আশংকায় বুকটা দুরু দুরু কেঁপে উঠলো। সীমান্ত অতিক্রম করে আসতে কোন অঘটন ঘটে যাইনি তো!

গেলাম আওয়ামী লীগ নেতা দেওয়ান ফরীদ গাজীর শেখ ঘাটের বাসায়। জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা তো এলেন, আমার ভাইটিকে কি করে এলেন? তিনি জানালেন, উনি ভালই আছেন, শীগগীর চলে আসবেন। কিন্তু সাথে সাথে তিনি আমাকে বললেন, আপনি এরেষ্ট! ফরিদগাজী তখন সিলেটের প্রশাসকও। সুতরাং বে-আইনের পরিবেশে তাঁর কথাই আইন। বললাম, অপরাধ? বললেন, আপনি কি সব ভবিষ্যদ্বাণী ছেপেছেন আমাদের বিরুদ্ধে? বললাম, এজন্যে? এটা কি আমার নিজের কথা নাকি? আর আপনাদের বিরুদ্ধে হলে আমার বিরুদ্ধেই বা নয় কেন? স্বাধীনতা সংগ্রাম আর মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্বটা কি আপনার একার নাকি? আমরা এর কেউ নই? তা হলে আমাদের এই ভিটে মাটি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াবার, ঘরে বাইরে লড়াই করার দরকাটা কী ছিল? গাজী সাহেব আমার জবাবে অবশ্য শান্ত হলেন। পরে শুনেছিলাম দরগা শাহজালালের মুতওয়াল্লী সরেহ্ কওম এ, জেড, আবদুল্লাহ্ই তাঁকে কানকথা বলে উত্তপ্ত করেছিলেন। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় অফিসে জালালাবাদীর পাশের কামরাই অবস্থানকারী জনাব মুহম্মদ উল্লাহ্ (পরবর্তী কালের রাষ্ট্রপতি)-কে সহোদরটির ব্যাপারে টেলিগ্রাম করলে তিনি কিন্তু অত্যন্ত সান্ত্বনামূলক জবাবী টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। সেদিন সত্যিই সেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক ছিল। এজন্য তাঁকে সর্বদা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

ষোলই ডিসেম্বরের সকালে দেশবাসী আমাকে এক ভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ করলো।

আমার হাতে ছিল সেদিন একটা গ্রেনেড। বিজয়ী মুক্তিবাহিনী দলে দলে পশ্চিম দিক থেকে সিলেট শহরে মার্চ করে ঢুকছিলো। আমি ব্যাণ্ডপার্টি সহ নেতৃত্ব দিয়ে তাদেরকে আমার এলাকায় সদর সম্ভাষণ জানাচ্ছিলাম। আর তারা যেন কোন দালালের বাড়ীতে ঢুকে অনর্থ ঘটিয়ে স্বাধীনতাকে কলংকিত না করে সে জন্যে নিজ হাতে একটা গ্রেনেড রেখে আপন পরিচয়টা তাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট রেখেছিলাম গায়ে লম্বা জামা। মাথায় টুপী। মুখে দাড়ি আর অপর দিকে হাতে একটি গ্রেনেড+ মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক। মুক্ত বাংলায় এ পরস্পর বিরোধী দৃশ্য আর কেউ কোথাও দেখেছে কিনা জানিনা। কিন্তু এই ছিল আমার সেদিনের পরিচয়। আজো আমার সে পরিচয়ের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

দেশটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তাই আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আর মুক্তিযুদ্ধ মানেই ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ নয় যে , দাড়ি টুপি বিসর্জন দিয়ে প্রগতিশীল সাজতে হবে। বরং আমার ধর্মীয় মূল্যবোধই আমাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। আর এ জিহাদের সময়ও আমি ধর্মেরই শিক্ষা অনুযায়ী রোজ কুরআন তিলাওয়াত করে নামাজ পড়ে পড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে বিজয় কামনা করেছি। যুদ্ধের সময়ও ব্যাংকারে শুয়ে শুয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আমারই অনুজের মুখে স্বাধীন বাংলা বেতারের কুরআনের তিলাওয়াত শুনেছে। সুতরাং ধর্মের ছোঁয়া লাগলেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই বিনষ্ট হয়ে যায়, এরূপ মতলবী প্রচারণা চালাবার একচেটিয়া অধিকার ও আমি কাউকে দিতে রাজী নই। দেশকে ভালবাসা যদি মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় হয়, তবে আমি একজন প্রথম সারির মুক্তিযোদ্ধা, আর টুপী দাড়ি ধর্মীয় প্রতীক যদি হয় রাজাকার আলবদরের পরিচয় , তবে এই পরিচয়েও আমিই এদেশের শ্রেষ্ঠ রাজাকার। এ দুটি পরিচয় নিয়েই আমি বাঁচতে চাই, মরতে চাই, পরকালে হাশরের ময়দানে উঠতে চাই।

ব্রিটিশ ভারতে এদেশের শ্রেষ্ট রাজনীতিবিদ ও জননেতা শেরে বাংলা এ, কে ফজলুলহক ওয়ার কাউন্সিলের সদস্য হয়ে (তাও বাংলার প্রধামন্ত্রীর পদাধিকার বলে, স্বেচ্ছায় নয়) সেই মিঃ জিন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে এমনি অন্যায় করেছিলেন, যিনি ছিলেন গোলটেবিল বৈঠক সমূহে শেরে বাংলার ব্যক্তিগত প্রাইভেট সেক্রেটারী। এ অপরাধে মিঃ জিন্নাহ শেষ পর্যন্ত তাঁকে দালাল আখ্যা দিয়ে মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কার করেছিলেন। ওয়ার কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেও তিনি অপবাদ মুক্ত হতে পারেননি। ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত নেতা মিঃ মোহন দাস করমচাদ গান্ধী ও মিঃ নেহরুর মত নেতারা নেতাজী সুভাষ বসুর দৃষ্টিতে দালাল ছিলেন। যদি দেশ

স্বাধীন হতো সুভাষ বোসের নেতৃত্বে আর তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক তৎপরতায় তাহলে ঐ নেতারাই হতেন বৃটিশের কলেবরেটর রূপে প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দী। কিন্তু সে গৌরব যেহেতু সুভাষ বাবুর ভাগ্যে লিখা ছিল না, তাই ঐ নেতারাই হলেন ভারতের জাতীয় বীর আর সুভাষ বাবু চিহ্নিত হয়ে রইলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিচ্ছিন্ন উল্কাপিণ্ড রূপে।

যদি আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন পরাস্ত হয়ে এখনকার কাদের সিদ্দীকীর মতো বিদেশেই রয়ে যেতেন তবে তাঁরাই চিরদিন বিজয়ী শক্তির লিখিত ইতিহাসে দুস্কৃতিকারী ও ভারতের চররূপে চিহ্নিত হয়ে রইতেন। বিজয় যেহেতু আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতেই (হোক না তা মিত্রশক্তির সহায়তায়ই) এসেছে, তাই রাজাকার আলবদররা হয়ে গেল ঘৃণিত দালাল আর আমরা দেশপ্রেমের একচেটিয়া ইজারাদার। তাই এদের কেউই যে দেশটা বৃহৎ আগ্রাসী ভারতের হিংস্র থাবায় রক্তাক্ত হয়ে অসাড় চেতনাহীন হয়ে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা হারাবে এই ভয়ে মুক্তিযুদ্ধের ও ভারতীয় সামরিক তৎপরতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি একথা কি কেউ হলফ করে বলতে পারবেন ? যদি তাই হয়, তবে দেশ প্রেমের ইজারাদার কেবল আমরাই হবো, তারা হবে না কেন ?

স্বাধীনতার দীর্ঘ দেড় যুগ পরে তাই আমাদের আর বিভেদ প্রচার করে জাতিটাকে শতধা বিভক্ত করা ঠিক হবে না। তাই যে-রাজাকার আর আলবদররা একদিন আমাকে হত্যা করার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, তাদেরকেই আমি বলতে চাই- তোমরা আমারই ভাই। ভুল করে আমাকে হত্যার জন্যে খঞ্জর আর বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছিলে। সেই বন্দুক আর খঞ্জর হাতে নেয়ার ইতিহাস আজ অনেক বাসি হয়ে গেছে। তাই হযরত ইউসুফ (আঃ) ও মহানবী (সাঃ)-এর মতো তোমাদের প্রতি আমার ঘোষণা ঃ লা-তাছরীবা আলাই কুমুল ইয়াওম-আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার আর কোন অভিযোগ নেই। চলো, আজ আমরা একত্রে দেশ গড়ার জিহাদে শরীক হই। আজ আমরা আর কেউ কারো শত্রু নই। আমরা সবাই ভাই ভাই-বাংলাদেশী।

হরিষে বিষাদ

স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতেই টুকের বাজার স্কুলে আমাদের বিজয়-সভার মাত্র দু'শ গজ দূরে জীপ দুর্ঘটনায় ছাতকের জাতীয় পরষিদ সদস্য জনাব মুহম্মদ আব্দুল হকের শাহাদত এবং ২০ শে ডিসেম্বর ঢাকা থেকে প্রাপ্ত প্রাণপ্রিয় উস্তাদ মওলানা অলিউর রহ্‌মানের শাহাদতের সংবাদ আমাদের বিজয়ের আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছিল। আল্লাহ্ তাঁদের এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদানের আত্মার মাগফিরাত করুন ! আমীন ! !

কী পেলাম ?

মুক্তিযু[illegible] বিনিময়ে কোন দিন আমরা কোন প্রতিদান চাই নি সরকার ও স[illegible] কাছে। বঙ্গব[illegible] মু[illegible] একদিন আমার অনুজে[illegible] কাছে অনেকটা কৈফিয়তের সুরেই বলে[illegible]ন, মওলানা সাহেব, আমার রাজনৈতিক সহচরদের অনেকেই মন্ত্রী–মিনিস্টার হয়েছেন। যদি ধর্ম[illegible] মন্ত্রণালয় আমাদের থাকতো, তবে আপনিই হতেন আমাদের ধর্মমন্ত্রী। কিন্তু যেহেতু সে পোর্টফলি[illegible] আমাদের [illegible] তাই আমি দু:খিত যে, আপনাকে কোন পদ দেয়া গেল না। তবে আমি তথা গোটা জাতি আপনার দানের জন্য ঋণী হয়ে রইলো। বলেই শেখ সাহেব, গনভবনে তার ব্যবহার্য্য দেরাজ থেকে দু হাতে দুটি এক শ টাকার নোটে লক্ষ টাকার বাণ্ডিল তুলে এনে টেবিলে রাখলেন এবং পরক্ষণেই দেরাজের আরো দুইটি বাণ্ডিলে হাত রাখলেন। তারপর মুহূর্তেই বল্‌লেন, আবার হিসাব কিসের ! যে কটি ইচ্ছে বাণ্ডিল আপনি উঠিয়ে নিন এবং কোন ব্যবসা ট্যাবসা করুন। এ জন্যে যে–কাউকে বল্‌তে হয়, আমি বলে দেব, আপনার লাইসেন্স পারমিটের কোন অসুবিধে হবেনা।" ছোট ভাইটি আমার মৃদু হেসে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বল্‌লো "ঠিক এ মূহুর্তে আমি সে রূপ কিছু চিন্তা করতে পারছি না। পরে প্রয়োজন হলে আপনাকে জানাবো।" বলাবাহুল্য, সে প্রয়োজন আর তার কোন দিনই হয়নি।

অনুরূপভাবে, আমার অনেক অতি উৎসাহী ইসলামসেবী বন্ধু ভেবেছিলেন, আওয়ামী লীগ আমলে বুঝি আমার পোয়াবারো হবে। আল্লাহ্‌র শোকর, কোন রূপ সরকারী আনুকূল্য অবৈধ ভাবে তো দূরের কথা, বৈধ ভাবে গ্রহণের বিন্দু মাত্র প্রয়োজনও আমি কোন দিন অনুভব করিনি। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ হাই কম্যাণ্ডের সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাকে আমি ব্যবসায়িক বা বৈষয়িক স্বার্থে আদৌ ব্যবহার করিনি। আমি আমার সে সু–সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে সে দিন জাতির পিতাকে বায়তুল মুকার্রমের সীরাতুন্নবী সম্মেলনে উপস্থিত করে মাদ্রাসা শিক্ষা যে টিকে থাকবে সে নিশ্চয়তার ঘোষণা করিয়েছি। রেডিও টি ভিতে কুরআন তিলাওয়াত ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি চালু করিয়েছি, মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করিয়েছি। সৌদি আরব বাংলাদেশের স্বীকৃতি না দেয়া সত্ত্বেও সেদিনের একচ্ছত্র অধিপতি বঙ্গবন্ধুকে বুঝিয়ে বাংলাদেশী হাজীদেরকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের পথে সৌদি আরবে রওয়ানা করিয়েছি। সেদিন শেখ সাহেব শুধু এ[illegible] করেই ক্ষান্ত হন নি, জুয়া ও রেসকোর্স বন্ধ করেছেন, তাঁর ভাষায়: "রেস ও জুয়া কিয়ামত পর্যন্তপর্যন্ত বাংলাদেশে বন্ধ থাকবে।" তিনি বায়তুল মুকার্রমকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে উন্নীত করেছেন। সে দিন আমিই ছিলাম এ সব ধর্মীয় কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধকারী আলেম। মোসাহেব আলেমদের মতো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে পৌরহিত্য করা আর লাইসেন্স পারমিট শিকারের বা মন্ত্রীত্ব বাগানোর চিন্তায় একদিনের জন্যেও আমরা বিভোর হইনি। তাই দৈনিক সংগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অধ্যাপক আখতার ফারুক একদিন বলেছিলেন, "সত্যিই আল্লাহ্‌র কোন কাজই হেকমত–শূন্য নয়। সে দিন যদি আপনারা দু ভাইও আমাদের সাথে শামিল হয়ে পড়তেন, তা হলে ইসলামের এ দুর্দিনে আজ কে হাল ধরতো?" শ্রদ্ধেয় মওলানা মুফতী দীন মুহম্মদ মরহুমও অনুরূপভাবে আমারই উদ্যোগে বায়তুল মুকার্রমে অনুষ্ঠিত প্রথম সীরাতুন্নবী সভা অনুষ্ঠানের পর আবেগ ভরে আমাকে জড়িয়ে ধরে খুশীতে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, ভাই ! আল্লাহ্‌ তোমার হায়াত দারাজ করুন ! ভেবেছিলাম, বাংলাদেশে বুঝি আর সীরতুন্নবী মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে না।.তুমি আমার সে ধারণাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত করে দিলে।" স্বয়ং শেখ সাহেব একদিন বলেছিলেন: আপনাদের দু'টি ভাইকে এ জন্যেই বড় ভাল লাগে। শেখ মুজিবের কাছে যারাই এসেছে, তারাই কোন না কোন মতলব নিয়ে এসেছে। কিন্তু আপনারা দু'টি ভাই যখনই এসেছেন জাতির কথা নিয়ে এসেছেন, আমার কর্তব্য নির্দেশ করার জন্যে এসেছেন। এ জন্যে আপনাদের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে।" গনভবনের জনৈক সিকিউরিটি অফিসারও একদিন আমার হাতে চুমু খেয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুরূপ উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: হুজুর বিশ্বাস করুন, আপনার এ আগমনের কল্যাণকর প্রভাব বঙ্গবন্ধুর মধ্যে কয়েকদিন পর্যন্ত বিরাজ করে। তিনি উপলব্ধি করেন, আমি মুসলমানদের নেতা বলেই আলেম–উলামারা আমার কাছে আসেন। [illegible]পনি একটু বেশী বেশী আসবেন !" আল্লাহ এ খেদমতটুকু কবুল করুন ! মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের বিনি[illegible] প্রাপ্ত এ পাওয়াটুকুই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। এ যেন আমাদের পরকালের পাথেয় হয়ে থা[illegible]মীন !

সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশের অন্যতম স্বীকৃত লেখক-আলেম মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল আযহারী ১৩৪৯ বাংলার ১৫ই বৈশাখ শুক্রবার সিলেটের টুকের গাঁওয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের স্কুলে। ৫৪ইং সালে জালালাবাদ রেঞ্জে ২য় স্থান অধিকার করে প্রাইমারী বৃত্তি লাভ। সিলেট ও ঢাকার সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা থেকে দাখেল, আলেম, ফাযিল, কামিল, আদিব ও আদিব কামিল ডিগ্রি লাভ (৫৮-৬৮ইং)। স্বল্পকাল সিলেটের সৎপুর আলীয়া মাদ্রাসা ও ঢাকার বাংলা কলেজেও লেখাপড়া করেন। সর্বশেষে আন্তর্জাতিক ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সের ও ডিগ্রি নেন মিশরের প্রখ্যাত জামে আযহার থেকে ১৯৮৭ সালে।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখক ও সংগঠকরূপে সুপরিচিত। পূর্বপাক জমিয়তে তোলাবায়ে আরবীয়ার নির্বাহী সভাপতি ছিলেন। ৬২-৬৩ইং সালের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের সূচনা তাঁরই হাতে। '৬৯ সালে ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ এবং '৭২ সালে জমিয়তুল মুদাররিসীনকে সংগঠিত করেন.।

'৭২ সালে মাদ্রাসা শিক্ষার চরম সংকট মোকাবেলা করেন জমিয়তুল মুদাররেসীনের সভাপতি, ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সদস্যরূপে। এ সময় তাঁরই প্রস্তাবে ও উদ্যোগে অর্থনীতি ও আখলাকিয়াত (নীতিশাস্ত্র) মাদ্রাসা পাঠ্যভুক্ত হয়। ঐ সময় তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে রীতিমত জুমার ভাষণ দিতেন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংকটমুক্ত জাতীয় জীবনে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ঐ সময় শেখ মুজিবকে তিনি বায়তুল মুকাররমের নবীদিবসের সম্মেলন উদ্বোধনের জন্য উপস্থিত করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর লেখার হাতে খড়ি সিলেটের মাসিক 'আল-ইসলাহ'। তারপর দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, দৈনিক জেহাদ, মাসিক মোহাম্মদী, মাসিক মদীনা, সবুজ পাতা, রংধনু, ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, WEEKLY YOUNG PAKISTAN, উর্দু দৈনিক পাসবান, করাচীর দৈনিক হুররিয়াত, সাপ্তাহিক আরাফাত, অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' সাপ্তাহিক 'নেজামে ইসলাম', সাপ্তাহিক বিচিত্রা, যুগভেরী সিলেট সমাচার, হেফাযতে ইসলাম, প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়।

তাঁর লিখিত/ অনূদিত/ সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'জীবন্ত মসজিদ সংগঠন', 'ইসলামের ডাক', 'ইসলাম ও রাজনীতি', 'ইমাম আবু হানিফা'; 'নবী চিরন্তন', 'জীবন সন্ধ্যায় মানবতা', 'ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিলো', 'আল-আদবুল মুফরদ', 'উমর ফারুক' (হায়কল), 'বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন', 'আসাহ্হুস-সিয়র', 'ফাযায়েলে রমযান', 'রসূলুল্লাহর পত্রাবলী', মহানবী স্মরণিকা, 'হজ্বঃ উমরাঃ জিয়ারত (সরকারী প্রকাশনা), সুকর্ণের পতন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, 'ইসলাম শিক্ষার পয়লা কিতাব', 'HOLY PROPHET'S MISSION TO CONTEMPORARY RULERS **মুসলিম শরীফ** ইত্যাদি।

তাঁর লেখক-প্রতিভা ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা মুহম্মদ আকরাম খাঁ, মওলানা নূর মুহাম্মদ আ'জমী (রহঃ), প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ), আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ), প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, শাহেদ আলী, শামসুল আলম প্রমুখ জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা সমাদৃত ও পরিপুষ্ট। এঁদের সকলেই তাঁকে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন।

সরকারী ও উচ্চ পর্যায়ের ধর্মীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে তিনি ১৯৮০ সালে ইন্দোনেশিয়া- মালয়েশিয়া, ১৯৮১ সালে সৌদী আরব, '৮৪ সালে গণচীন ও '৮৬-৮৭' সালে মিসর সফর করেন। এছাড়া '৭১ সালের অগ্নিঝরা দিনগুলিতে ভারতের শিলং সফরও করেছিলেন। রেডিও বাংলাদেশ থেকে তাঁর ধর্মীয় কথিকা প্রচারিত হয়ে থাকে।

তিনি গণভবন সরকারী মসজিদের পেশ ইমামও খতীব। বাংলাদেশ ইমাম সংস্থার সভাপতি, মহানবী স্মরণিকা পরিষদের সম্পাদক এবং শিক্ষাপ্রচার মিশনের প্রতিষ্ঠাতা-সহসভাপতি। তিনি বাংলা একাডেমীর লেখক-সদস্য হন ১৯৬৫ সালে তাঁর ছাত্রজীবনেই। ব্যক্তিগত জীবনে মওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ৩ পুত্র ও ২ কন্যার জনক।